কৃষ্ণ যখন প্রেমিক



প্রবোধকুমার সান্যাল

সাহিত্য সংস্থা
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

KRISHNA JAKHON PREMIK

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ
৭ই জুলাই, ১৯৬৪

প্রচ্ছদ
গণেশ বসু

মুদ্রক
কমল মিত্র
নব মুদ্রণ
১বি, রাজা লেন
কলিকাতা-৯

কামনাময়ী ঊষা



মধ্যরাতে ঘুম সহসা ভেঙে যাবার পর মনের আকাশে একটি দুটি অনেক তারার নিদ ভাঙে। কিন্তু কেন এমনটি হলো, সবেমাত্র ঘুম থেকে ওঠা রাজনন্দিনী ঊষা কার কাছে জানবে এই প্রশ্নের উত্তর?

আঁখি দুটি ক্রন্দন আতুরা হলো তার। মনে হলো, সেই দূর শৈশব থেকে মনের মধ্যে জমিয়ে রাখা দুঃখের পদ্মকুঁড়ি। এখন বোধহয় পাপড়ি মেলেছে।

হায় ঊষা, একি হলো তোমার? কার কথা চিন্তা করে এই মধ্যযামিনীতে তুমি হলে হারা

পাশে যিনি শায়িতা ছিলেন, সুকামিনী চিত্রলেখা, তাঁর কানে এখন পৌঁছে গেছে প্রিয় সখির এই আর্তনাদ। তাঁর চিত্তে জেগেছে উদ্বিগ্নতা। তিনি প্রশ্ন করেন—সখি, স্বপ্নে কি দেখেছিস, সব কথা খুলে বল আমাকে। দোহাই তোকে, কোন কথা তুই গোপন করিস না।

চিত্রলেখা জানেন, প্রিয় সখি ঊষা, কোন্ পুরুষ প্রবরের ধ্যানে মগ্ন! কিন্তু, আজ পর্যন্ত তাঁর নাম সে কি স্বকণ্ঠে উচ্চারণ করতে পেরেছে।

চোখ দুটি বন্ধ করেন ঊষা। বলতে থাকেন—চিত্রলেখা, তুই আমার প্রিয় সখী, আমরা জীবনের অনেক গোপন খবর তোর কাছে আমি অনায়াসে প্রকাশ করে দিয়েছি। কিন্তু, কাল রাতে কি যে হলো আমার! স্বপ্নের মধ্যে কাকে নিরীক্ষণ করলাম—সে কথা আমি বলবো কেমন করে? মনে হলো, হঠাৎ যেন জ্বলে উঠেছে হাজার সূর্যের আলো। তারই এক অদ্ভুত আলোক শিখায় প্রদীপ্ত হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে।

বলতে বলতে সহসা কেমন যেন হয়ে গেলেন ঊষা। অবাক চোখে চিত্রলেখা দেখলেন, চেতনা হারিয়েছে ঐ মেয়েটি!

এর আগেও বেশ কয়েকবার ভাবাবেগে এমন ভাবেই চেতনাহীনা হয়ে পড়েছিলেন ঊষা।

সুতরাং চিত্রলেখা শীতলবারির সিঞ্চন করেন। তারপর আপন আননটি অবনমিত করেন। ঊষার কপালে এঁকে দেন পরিতৃপ্ত চুম্বনের রেখা।

চিত্রলেখা বুঝতে পেরেছেন, এতোদিনে বোধহয় ঊষার হৃদয়ের একটি বাসনা পূর্ণ হয়েছে। প্রেমাস্পদকে স্বপ্নে নিরীক্ষণ করেছেন তিনি!

অনেকক্ষণ এইভাবে অচেতনা অবসন্না হয়েছিলেন ঊষা। তারপর মনে হলো, তাঁর, কে যেন দূর থেকে তাঁকে চুম্বন করেছেন। কে তিনি? তিনি কি তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়সখা?

অবশেষে বোধহয় সেই নিদ্রা ভেঙে গেল ঊষার। তিনি হলেন মহাবলী বাণ—

কন্যা। সবেমাত্র সতেরোটি বসন্ত অতিক্রম করেছেন। তাঁর এই রূপকল্পতার কথা লোকের মুখে প্রচারিত হতে হতে অনেক দূরে পৌঁছে গেছে।

অনেকে এসেছেন পতঙ্গের মত। তাঁর অগ্নিসমা রূপের আগুনে জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হতে। তাঁদের পরিণতি হয়েছে হতভাগ্য ঐ লোভী পতঙ্গের মতই। তাঁরা মৃত্যুকেই জীবনের একমাত্র আশ্রয় হিসাবে আলিঙ্গন করতে বাধ্য হয়েছেন।

হবে নাইবা কেন? দৈত্যরাজের শত সতর্ক প্রহরা সব সময় ঘিয়ে থাকে কন্যাকে! এমন সাহসী পুরুষ প্রেমিক কি আছেন, যিনি এই প্রহরা অতিক্রম করে কুমারী ঊষাকে স্পর্শ করার স্পর্ধা করবেন?

সকলেই ভাবতেন, যাঁদের তিনি ঘৃণা করে এসেছেন, সেই মানুষ অথবা দেবপুরুষ এসে তাঁর কন্যাকে শিহরিতা—করবে প্রাণ থাকতে তা হতে দেবেন না মহাবলী বান। তিনি যে দৈত্য শ্রেষ্ঠ বলীর অন্যতম পুত্র। সমস্ত দানবকুলে তাঁর প্রতিপক্ষ আর কে হতে পারে?

এছাড়া, আরো একটি প্রতিজ্ঞা ছিল তাঁর। তিনি ধর্ম শাসনের অধিকার ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছেন। সারা পৃথিবীতে তাঁরই শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। বিষ্ণু নামধারী কোন দেবতার প্রভাব অথবা প্রতিপত্তিকেই তিনি সহ্য করতে পারেন না। তিনি জানেন, এই ধরিত্রীর বুকেই তাঁকে ঐ অধর্মের জয় পতাকা উড্ডীন করতে হবে। সেইজন্য শুরু করেছেন কঠিন কঠোর তপস্যা। এমনকি দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপাও লাভ করেছেন। নিজেকে ভেবেছেন বিশ্বের ভেতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তখনই তাঁর উৎকণ্ঠিত মন শুধু অনুরণিত হয়েছে একটি প্রশ্নে।

করজোড়ে তিনি জানতে চেয়েছেন তাঁর মৃত্যু সৎক্রান্ত সংবাদ। পিনাকপাণি হেসে উঠেছেন। বলেছেন—তোমার কন্যার কৌমার্যের মধ্যেই লুকিয়ে রইলো তোমার আয়ু।

এই কথার অর্থ বুঝতে পারেন নি দৈত্যরাজ, কি অসম্ভাব্য এক জীবনের প্রতিশ্রুতি। তিনি জানতেন না, কিভাবে কখন কবে তাঁকে ঐ অভিশাপ অথবা আশীর্ব্বাদের দ্বারা আক্রান্ত হতে হবে!

ভবিষ্যতে যা হবার হবে, বর্তমানের মহারাজা হয়ে স্বর্গ-মর্ত্য পাতালের অধীশ্বর হবেন তিনি। মনের মধ্যে সঙ্গোপনে এমন একটি বীভৎস বিভীষিকার ছবি এঁকেছেন মহামতি বান। সেইমত শুরু করেছেন তাঁর অত্যাচার। অতএব প্রমাদ গুনতে হয়েছে বিষ্ণুকে। তিনি যে স্থিতির দেবতা। সেখানে যখন পাপের হাহাকার শোনা গেছে, ভুলুণ্ঠিত হয়েছে মানবাত্মা, ধর্ষিতা হয়েছে নারীর দল, তখনই তিনি সুদর্শন চক্র হাতে হাজির হয়েছেন।

কিন্তু বাণের সাথে সম্মুখ সমরে লিপ্ত না হলে কিভাবে ঐ মহাবৈরীকে আক্রমণ করবেন শ্রীকৃষ্ণ?

ভাবতে ভাবতে অন্য একটি কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

তিনি তো প্রেমের রাজা। আবার প্রেমের ভিখারী। প্রেমের নৈবেদ্য সাজিয়ে তিনি রূপ-যৌবনের আরতি বন্দনা করেছেন। অতএব, এখন যদি তিনি আবার এমন ভাবেই সেজে ওঠেন এক প্রেমপূজারী হিসাবে, তাহলে কি হয়?

মৃদু হাসিতে তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডল পরিপ্লাবিত হয়ে ওঠে। তিনি বুঝতে পারেন, এবার শত্রু নিধনে তাঁকে সম্পূর্ণ নতুন ছদ্মবেশে সেজে উঠতে হবে!

তাই কি ঊষা আজ আকুলা হয়ে উঠেছেন। প্রতি মুহূর্তে কি এক আশ্চর্য স্পন্দনে তাঁর বরতনু থরথর করে কাঁপছে।

স্বপ্নে দেখছেন তিনি এক আশ্চর্য নীলাম্বর পুরুষকে। যাঁর সাথে মেতে উঠেছেন অলৌকিক মৈথুনে। সেই মৈথুন জনিত আনন্দ প্রবাহিত হচ্ছে, তাঁর যুবতী দেহের সর্বাঙ্গে। মাঝে মধ্যেই শিহরিতা হচ্ছেন তিনি। স্বপ্ন ভেঙে গেলে আশাহীনতার দর্পণে নিজের হত ক্লান্ত ক্লিন্ন মুখের প্রতিচ্ছবি দেখছেন!

কে এসে এমন ভাবে মধ্যরাতে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়? বাকি রাতটুকু আমাকে এক অনিশ্চিত দোলাচলের মধ্যে কাটাতে হয়?

কার কাছে গিয়ে ঊষা এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইবেন?

ছটফট করতে থাকেন তিনি। কোথায় লুকিয়ে আছে এই রহস্যের উত্তর? সেটা না জানা পর্যন্ত ঐ সদ্য তরুণীর মন ক্ষণকালের জন্যেও তৃপ্ত হতে পারবে না!

ইতিমধ্যে তাঁর জীবনে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। সেদিন শোনিতপুরের চৈত প্রাসাদের অন্তঃপুর স্থলে একটি শিবালয়ে নিভৃতে বসে তিনি মহাদেবের ধ্যান করছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো মহাদেব লিঙ্গের রূপ রহস্য, তিনি মনে মনে প্রশ্ন করলেন—যোনি পর্বের ওপর কেন এই লিঙ্গ সংস্থাপিত হয়েছে।

এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যে উপাস্যা উমাকে স্তব করলেন, উমা তুষ্টা হলেন ঊষার আরতি বন্দনাতে। দৈত্য দুহিতার কাছে তিনি প্রজনন রহস্য উন্মোচন করলেন।

অনিবার্য পরিণতির জন্যেই এইভাবে যোনি এবং লিঙ্গের চিরন্তন সংযোজন দরকার। তা না হলে পৃথিবীর বুক থেকে মনুষ্যজাতির ইতিহাস বিনষ্ট হয়ে যাবে। এই সুগুপ্ত জ্ঞানের অধিকারিণী হলেন ঊষা। আবার তাঁর অন্তর কেঁদে উঠলো! কবে তিনি ইপ্সিত ঐ লিঙ্গটির সাক্ষাত পাবেন?

স্মিত হাস্যে পার্বতী জবাব দিলেন—বৎসে, পরিতাপ পরিত্যাগ করো, অচিরেই তুমি তোমার মনোমত পুরুষ প্রেমিকের সাথে মিলনে অংশ নিতে পারবে।

সত্যিই কি? দেবী হৈমবতী আশীর্বাদ করলেন, বৈশাখী দ্বাদশী রজনীযোগে স্বপ্ন দর্শনের মধ্যেই যেন সুকুমারী ঊষা দেহ-সম্ভোগের আশ্চর্য অনুভূতি লাভ করলেন। কিন্তু কোথায় মিলতে পারে এই আগুন শিখা। ক্রমশঃ তা এক দুরন্ত দূর্বার বহ্নি হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। ঐ দেখা যাচ্ছে, তার শিখা আকাশকে গ্রাস করেছে। সারা পৃথিবীতে যেখানে যা কিছু বস্তু আছে, সবকিছু জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেই বোধহয় ঐ অনলশিখা নির্বাপিত হবে।

কার কাছে তিনি জানাবেন হৃদয়ের এই গোপন কথা? চিত্রলেখা ছাড়া আর কাকেই বা শোনাবেন তাঁর যৌবন দিনের এই অস্থিরতার গল্পকথা? চিত্রলেখা অবাক হয়ে শুনতে থাকেন। শোনেন তিনি, স্বপ্নের আবছায়া আর মোহমুগ্ধ কাহিনী।

শোনেন তিনি এক অজ্ঞাতপূর্বা প্রেমের ইতিহাস। কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে গেছেন, আজীবন যাঁর সাথে সখ্যতার সুমধুর সম্পর্ক, দুজনে একসাথে পা রেখেছেন যৌবনের যৌবরাজ্যে, ঊষাকে কিভাবে তিনি সান্ত্বনা দেবেন, সেই শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না।

ভাবতে থাকেন বিষণ্ণা ঊষা, সংক্রামক আর্তিতে এখন হারিয়েছেন তিনি নারীত্বের সমস্ত সাহস।

কি করা যেতে পারে, তিনি তো জানেন না, স্বপ্নে কোন পুরুষ এসে এইভাবে প্রিয়সখীর সর্বশরীরে এক প্রবহনের সৃষ্টি করেন? কে তিনি?

অবশেষে শেষ উপায় স্বরূপ নিজের তুলিকাখানি হাতে নিলেন চিত্রলেখা। যেমনটি বলছেন ঊষা, তেমনটি আঁকছে ছবি তাঁর দুটি হাত। এ ব্যাপারে চিত্রলেখা যথেষ্ট পটিয়সী।

চোখ বন্ধ করে ঊষা বিবৃত করতে থাকেন মধ্যরাতের স্বপ্নে দেখা সেই আশ্চর্য পুরুষের দেহ বল্লরী।

এবং সাদা পট্টবস্ত্রের ওপর ধীরে ধীরে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে সেই মোহময় মূর্তি।

ঊষা বলছেন—তাঁর শরীরের রঙ নবজলের মত। তাঁর মুখের সর্বত্র লেগে আছে প্রশান্ত হাসির টুকরো, সর্বাঙ্গে তিনি রত্নালঙ্কার ধারণ করেছেন। চন্দনে চর্চিত করেছেন তাঁর শরীর। সেখান থেকে নির্গত হচ্ছে অপূর্ব গন্ধ। তাঁর চোখ দুটি যেন সুধা বর্ষণ করছে। আজানুলম্বিত বাহুকে দেখলেই আলিঙ্গনের ইচ্ছা জাগে।

নাসিকার সাথে তিল ফুলের সম্বন্ধ আছে। পুষ্ট দুটি ওষ্ঠাধর বিস্ময় হয়ে উঠেছে। মরাল নিন্দিত কণ্ঠে অসংখ্য বলিরেখার দাগ। তাঁর দাঁতের সারি বুঝি মুক্তার মত!

বল সখী, এভাবে এখন তুই শেষ করিস না তোর শব্দের এই খেলা। আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার হাতের তুলিকা কেমন প্রাণস্পন্দনে থরথর করে কাঁপছে। এই তো আমি শেষ করেছি ঐ পুরুষটিকে আঁকা। বলি সখী, আর কি দেখেছিস তুই অর্ধজাগরণে?

আরো বলতে থাকেন ঊষা—সেই ভ্রূ যুগল যেন কামধেনু। তার নীচে বিচ্ছুরিত হয়েছে পঞ্চশর। গগনের মত বিস্তৃত তাঁর ললাট। তিলক সেখানে তাকিয়ে আছে এক আকর্ষণের ভঙ্গিতে।

আরো কি, আরো কি দেখেছি আমি? চিত্রলেখা, সব কিছু মনে পড়ছে নারে।

চোখ বন্ধ করেন ঊষা, চিত্রলেখা ক্ষণস্তব্ধা হয়ে তাকিয়ে থাকেন। বুঝতে পারেন, আরো কিছু কথা রয়ে গেছে বাকি। হয়তো লাজশীলা ঊষা সবকিছু উচ্চারণ করতে পারছেন না। তিনি অভয় দিলেন। তিনি বললেন—সখী, তোর কোন ভয় নেই। কারো কাছে আমি তোর এই রতি বিহারের কাহিনী শোনাবো না।

চোখ বড় বড় করে ঊষা বলতে থাকেন—সুকুঞ্চিত কেশবাস যেন সিংহ স্বরূপ স্কন্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মনে হয় সেই ফুল্ল গণ্ডে আমি একটি চুম্বন চিহ্ন আঁকি।

আরো দেখেছি, কুণ্ডল মণ্ডিত কর্ণ, সেখানে সূর্যের বিচ্ছুরণ। হায় সখি, তিনি হলেন নবযৌবনের দ্যোতক। এই পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে কন্দর্প কান্তি আর কেউ নেই।

তিনি হলেন পৃথিবীর সকল কামিনীর আত্মার আত্মীয়, প্রেমের যুবরাজ। সখি চিত্রলেখা, তুই কি সত্যি সত্যি তাঁর অবয়ব তুলে ধরেছিস তোর মায়া মুগ্ধতা ভরা ঐ তুলিকার টানে?

তখন সবেমাত্র শিল্পী চিত্রলেখা শেষ টানটি দিয়েছেন। তারপর, ঐ ছবির ওপর চোখ পড়তেই শিহরিতা হয়েছেন তিনি। একি! স্বপ্নে নিশি জাগরণে কাকে দেখেছেন ঊষা! তিনি তো আর কেউ নন? তিনি হলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি ঐ শ্রীকৃষ্ণ!

চমকিতা হয়ে উঠেছেন বান—তনয়া। সেই আলেখ্য দর্শন মাত্রই তাঁর অনিমিখ দুটি আবিষ্ট নয়নের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

এই তো সখি, তুই ঠিক রূপটি ফুটিয়ে তুলেছিস।

দুটি যুগলবাহুকে প্রলম্বিত করেছেন তিনি। আপন বক্ষে সেই চিত্রায়িত মূর্তিখানি স্থাপন করেছেন, আবার ঢলে পড়েছেন মুর্চ্ছার অঙ্গনে।

ভাবছেন, চিত্রলেখা, হায়, কি লেখা আছে বিধাতার মনে? এ কি করে সম্ভব? ঈশ্বর অবিশ্বাসী দানবের কন্যা কি আপন বক্ষে ধারণ করতে পারেন ঈশ্বরকে?

আর্যত্রাস বানের দুহিতা কি আর্যকুল পূজ্য পুরুষোত্তমের প্রণয় ভিখারিণী হতে পারেন?

ছটফট করতে থাকেন তিনি, শেষ পর্যন্ত এক অদ্ভুত চেতনা এসে তাঁকে গ্রাস করতে থাকে। যেমন করেই হোক এই চিত্রপটখানি ছাড়িয়ে নিতে হবে। তাই করেন চিত্রলেখা। তিনি ছুটতে ছুটতে চলে যান অসুর সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্য দৈত্য শ্রেষ্ঠ কুম্ভাণ্ডের কাছে। কুম্ভাণ্ড তাঁর পিতা। কন্যা বাৎসল্যরস সব সময় প্রবাহিত হয় তাঁর অন্তরে।

তিনি অবাক হয়েছেন কন্যার হাতে ধরা এই চিত্রপটটি দেখে।

এ যে বাসুদেবের পৌত্র, পৃথিবীর বুকে অনিরুদ্ধ নামে পরিচিত। রুক্মিনী গর্ভে উৎপাদিত যাদব রূপে ভূতলবিহারী সে নানাভাবে দৈত্যদের ক্ষতির কারণ হয়েছে। তাঁরই পিতার হাতে হত হয়েছেন দৈত্যদের চিরনির্ভর স্বজন রূপী শম্ভুরাসুর। চীৎকার করে ওঠেন দৈত্যশ্রেষ্ঠ কুম্ভাণ্ড।—কন্যা, তুমি অচিরে এই চিত্রপট অগ্নিতে নিক্ষেপ করো।

ইতিমধ্যে পিতার কাছ থেকে ঐ যুবা পুরুষের পরিচয় জানতে পেরেছিলেন চিত্রলেখা। অবাক হয়েছেন তিনি, যে ছবি দেখে মূর্ছিতা হয়েছেন বিকশিত মদন বেগা রাজাঙ্গনা, তিনি আর কেউ নন, তিনি অসুরবৈরী।

ঊষা—প্রিয় অনিরূদ্ধ, যুগাবতার শাশ্বতের পৌত্র। ঈশ্বরের পূণ্যাশীষ বইছে তাঁর ধমনীতে।

অনিরুদ্ধ, এক মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা। এই পৃথিবীতে কেউ নাকি তাঁর সাথে সন্মুখ পেরে ওঠেন না। অপ্রতিরোধ্য তাঁর গতি। তিনি যেখানে যান, চারপাশে শুরু হয়ে যায় ভূকম্পন।

অসুরের জাগ্রত সন্ত্রাসকে রুখে দিয়েছেন তিনি। আর শেষ পর্যন্ত অসুর কন্যা কিনা তাঁকেই জীবনের একমাত্র পুরুষ হিসাবে বরণ করতে চলেছেন?

শিহরিতা হয়ে ওঠেন চিত্রলেখা। তিনি জানেন, ঊষার এই আত্ম উন্মোচনের ফলাফল কি হতে পারে? চকিতে তিনি চলে যান নিদ্রামগ্না ঊষার কাছে। আবেগের আশ্লেষে তাঁকে আলিঙ্গন করেন। চারটি স্তনের মিলন ঘটে যায়। দুই সখী পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে থাকেন।

* * *

কি করা যেতে পারে, ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত ছদ্মবেশ ধারণ করে দ্বারকাতে এলেন চিত্রলেখা, যেমন করেই হোক তাকে দেখা করতে হবে যাদব গৃহে অনিরুদ্ধের সাথে।

মুনি শ্রেষ্ঠ দেবর্ষির কাছ থেকে তিনি তামসী বিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রচ্ছন্ন অবস্থায় দ্বারকার কেন্দ্র প্রাসাদে প্রবিষ্টা হলেন। তখন কৃষ্ণ পৌত্র অনিরুদ্ধ নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। তাঁকে দেখে লজ্জা পেলেন বোধহয় চিত্রলেখা।

এই অপূর্ব কন্দর্পকান্তি চেহারার কতটুকুই বা তিনি ফোটাতে পেরেছেন তাঁর তুলিকার সাহায্যে?

অনন্তের পৌত্র বলেই বোধহয় এই স্বর্গীয় কান্তির অধিকারী হয়েছেন তিনি!

মনে মনে তাঁকে মেনে নিতে হলো, যদিও বিভাজন আছে, কিন্তু, রূপে শ্রেষ্ঠা ঊষার জীবন সঙ্গী হতে পারেন এই অনিরূদ্ধ!

দৈত্যদুহিতা ভাবতে থাকেন, কিভাবে অনিরুদ্ধের হৃদয়ে জাগরিত করবেন শাশ্বত প্রেম? কিভাবে তাঁর কাছে উত্থাপন করবেন সব কিছু?

তাঁর হৃদয়ের নিভৃতে এক নতুন ভাবের উদয় হয়। যদিও তিনি প্রিয় সখীর দূত হিসাবে এই প্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন, আচম্বিতে দর্শন করেছেন অনিরুদ্ধকে, কিন্তু তিনিও তো নারী, তাঁর হৃদয়ে তো একই কাম আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। অনিরুদ্ধকে দেখে যদি তা আরো দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে, তিনিও যদি ঐ যুবকটির সাথে স্বপ্ন-সম্ভোগে মত্ত হন, তাহলে কি কোন ক্ষতি হবে?

চিত্রলেখার মনে হয়, তিনি বোধহয় এই দেবতার পায়ে নিজেকে উৎসর্গীকৃতা করবেন বলেই এতোদিন অচুম্বিতা এবং অস্পর্শিতা ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত এই সাময়িক মোহ অতিক্রম করতে সমর্থ হন দৈত্যকন্যা। যেমন করেই হোক ঊষার সাথে অনিরুদ্ধের একটা দেহ—সূত্রতা স্থাপন করতে হবে।

অবশেষে চিত্রলেখার কণ্ঠমাধুর্য ধ্বনি অনিরুদ্ধের হৃদয়কে আপ্লুত করেছিল। ছদ্মবেশ

ধারণ করে তিনি মিলিত হয়েছিলেন কামাতুরা ঊষার সাথে, কামনার কুসুম দিয়ে গড়া ঐ রমণীর সর্বাঙ্গে ঘটিয়ে দিয়েছিলেন রাগ দীপন। ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর চুম্বন আবেশ মুখ মদিরার সর্বত্র।

আপন আনন্দে তখন অস্থিরা হয়ে উঠেছেন ঊষা। পৃথিবীর কেউ তাঁদের এই গোপন অভিসারের কথা জানতে পারেননি। শুধু জেনেছেন একজন, যাঁরই ইচ্ছাতে এভাবে ঊষাকে আজ তাঁর পৌত্রবধূ হিসাবে আবির্ভূতা হতে হয়েছে। তিনি আর কেউ নন। তিনি হলেন বিশ্ব সংসারের নিয়ন্ত্রক ঐ শ্রীকৃষ্ণ।

তাঁরই অদৃশ্য ইচ্ছাতে তখন অনিরুদ্ধ আর ঊষা পারস্পরিক উষ্ণতায় দহন দগ্ধ ক্লান্ত প্রহর কাটাচ্ছেন। মাঝে মধ্যেই শিহরিত হচ্ছেন সঙ্গমজনিত আনন্দে। মৈথুন বাহিত শক্তিতে উদ্দীপ্ত।

দূর থেকে অপলকে নর-নারীর এই শৃঙ্গার দেখতে দেখতে কেমন যেন হয়ে যান চিত্রলেখা। ভাবতে থাকেন তিনি, আমিও তো যৌবন মদমত্তে ঊষার সমকক্ষা হতে পারি। হয়তো আমি তাঁর মত অভিজাতা নই। কিন্তু, আমার কি নেই—যা দিয়ে আমি অনিরুদ্ধের মন ভরাতে পারবো না?

পরক্ষণেই মনে হয় তাঁর, অনিরুদ্ধ যদি সুভদ্রা নাম্নী সেই রূপমতী প্রথমা পত্নীকে বিস্মৃত হয়ে ঊষার সাথে এই ভাবে শরীর সুখের খেলাতে মেতে উঠতে পারেন, তাহলে আমিই বা কেন অনিরুদ্ধের কাছে আমার বুভুক্ষু হৃদয়ের প্রেম নিবেদন করবো না? কেন বলবো না—হে প্রিয়ে, হে সখা, আমি যে তোমার জন্যে তৃষিতা তাপিতা হয়ে অপেক্ষারতা। তুমি আমার এই নরম বুকের মাঝখানে হাত দিয়ে দেখো, আমি সযত্নে সেখানে সঞ্চয় করেছি নবনীত! তুমি এসে আমার হৃদয় উৎসারিত বসন্ত বায়ুধারার প্রচণ্ড বেগ রোধ করো।

এমনই এক আকাঙ্খা নিয়ে স্খলিত বসনা চিত্রলেখা একদিন হাজির হয়েছিলেন অনিরুদ্ধের কাছে। কিন্তু হায়, অনিরুদ্ধ তাঁর দিকে ফিরেও তাকাননি' বরং অপমানের আগুন শিখায় তাঁকে দগ্ধা করে ছিলেন।

অন্তঃপুরে ফিরে এলেন অপমানিতা নির্যাতিতা চিত্রলেখা। মনের মধ্যে জ্বলে উঠলো প্রতিহিংসা। কিভাবে তিনি তাঁর প্রিয় সখী উষার জীবনে নিয়ে আসতে পারেন অমাবস্যার অন্ধকার, সেই কথাই চিন্তা করতে থাকলেন।

অনতিবিলম্বে এই গোপন অভিসারের কাহিনী পৌঁছে গেল দৈত্যরাজ বানের কানে। বাণ শিহরিত হলেন। বাণ বিশ্বাস করতে পারেননি, তাঁর নিশ্চিদ্র ঐ প্রহরার মধ্যে কোন পুরুষ এভাবে প্রবেশ করতে পারেন! অবশেষে একদিন নিজেব চোখে সব কিছু দেখলেন তিনি।

সপ্তদশী কন্যার এই কুলটা বৃত্তিতে ব্যথিত হলেন।

পরের দিন, তাঁর অঙ্গুলিহেলনে আলিঙ্গনরত অনিরুদ্ধকে বন্দী করা হলো। একের

পর এক বলশালী রাক্ষসেরা তখন রচনা করেছে এক ব্যূহ। কিছুতেই তারা অনিরুদ্ধকে আর জীবন পথের পথিক হতে দেবেনা।

সবার আগে ছুটে এসেছেন বান। ক্ষমা করবেন না তিনি দুষ্পর্ধী এই কন্যা হরককে। বান ভেবেছিলেন, অচিরেই ঐ শত্রুর প্রাণ হরণ করবেন। তাঁর ছিন্নিত মস্তকখানি নিক্ষেপ করবেন পুরুষোত্তমের পদতলে। কিন্তু এই জীবনে প্রথম তাঁকে প্রতিহত হতে হলো। রুদ্ধ হলো তাঁর গতি।

অন্ধকারাবৃত গগনে সহস্র সূর্যের আলোক দীপ্তির ছটা দেখা গেল।

কে এসেছেন সেখানে? বাণ শুনতে পেলেন, আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে মন্দ্রিত হয়েছ ঐ জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর—হে অসুর, চৈতন্যাত্মক প্রকাশক জ্যোতি আমার বিভূতি। একথা বিদিত হও তুমি, আমি এসেছি, ধর্মের জয়পতাকা উড্ডীন করবো বলে।

হিংসায় উন্মত্ত বাণাসুর তখনো আক্রমণ করার চেষ্টা করছেন অনিরুদ্ধকে। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, তাঁর পিতার সাবধান বাণী। যাদবকুলের ওপর হিংসাঘাত করোনা পুত্র। তাহলে মৃত্যু-ভয় ঘটে যাবে।

বাণাসুর তাকালেন বাসুদেবের দিকে। উৎগীর্ণ হয়ে উঠলো রাশি রাশি শত্রুতার বিষ ভাণ্ডগুলি। অকথ্য ভাষায় অপমান করলেন পুরুষোত্তমকে।

অসুররাজ জনার্দনের ঠোঁটের কোণে হাসির টুকরো লেগে রইলো। এই পৃথিবীতে তিনি তো চিরদিন সাধারণ মানুষকে রক্ষা করবেন শতসহস্র অত্যাচারের হাত থেকে। তিনি তখনো চেয়ে আছেন এবং ভাবছেন তাচ্ছিল্য সহকারে, ইচ্ছা করলে এখনই তিনি বাণকে হত্যা করতে পারেন। হয়তো সেই কাজ তাঁকে আপন হাতে করতে হবে।

তখন আরো বেশী যুদ্ধাতুর হয়ে উঠেছেন বাণাসুর। তিনি চাইছেন, সম্মুখ সমরে কৃষ্ণকে পরাজিত করতে। যে যাদবকুল তাঁর সমগ্র শাসনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে, তাদের সমূলে উৎপাটিত করতে হবে।

কিন্তু হায়, কোন কিছু করার আগেই ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন বাণাসুর। যন্ত্রণায় চীৎকার করতে থাকলেন। মৃত্যুভয়ে তখন থরথর করে কাঁপছেন তিনি। এতোদিন তিনি ভেবেছিলেন, মহাদেবের তেজে বলীয়ান, পৃথিবীতে তাঁর কোন বৈরী নেই।

এখন, চোখের সামনে সাক্ষাত মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে বাণ বুঝতে পারলেন, পিনাকরুদ্রের ঐ অভিশাপ অথবা আশীর্বাদের মর্মবাণী। পিনাকরুদ্র বলেছিলেন—কন্যার কারণেই মৃত্যু হবে তাঁর।

কি আশ্চর্য, সেই কথাটি এখন দারুণ ভাবে মিলে গেছে।

শেষ অব্দি অবশ্য বাণ প্রার্থনা করেছিলেন করজোড়ে—দেবতার কাছে। আর সেই প্রার্থনায় সাড়া দিতে বাধ্য হয়েছিলেন বাসুদেব। বাণের মৃত্যু হয়নি। উষাকে বেদার্থিত গান্ধর্ব মতে বিয়ে করে তাতে উপগত হয়েছিলেন প্রদ্যুম্ন পুত্র। শর্তাভিশাপের ভিন্নমাত্রা সংগঠন থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তিনি।

বাণকে নিয়ে কৈলাস অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন মহেশ্বর, যাবার আগে নিজের কন্যা এবং জামাতাকে আশীর্বাদ করেছিলেন বাণ।

এতোক্ষণে বোধহয় সম্বিত ফিরে পেলেন ঊষা। ভাবতেও পারেননি তিনি, এইভাবে বাসুদেব কৃষ্ণ ছলচাতুরি মাধ্যমে দৈত্য কুলপুরোহিত বানকে নিষ্ক্রিয় এবং নির্জীব করে দেবেন।

ক্রোধান্বিতা হলেন তিনি এবং তখন তাঁর সামনে কৃষ্ণ উদ্ভাস করেছেন নিজের আসলরূপ। তিনি ঘোষণা করছেন—সর্ব জীব রতি আমাতে। আমি সর্বকালেই রাগ-দ্বেষহীন অবস্থায় থাকি। হে কন্যে, তুমি কেন পিতার জন্যে শোক করছো। তুমি একবার চোখ বন্ধ করো। তোমার গতজন্মের কথা স্মরণ করো।

ঊষার মানস চোখে তখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে পুরাতনী স্মৃতি।

তিলোত্তমা হিসাবে তিনি উদ্ভুতা ছিলেন। সেকথা মনে পড়ে গেছে তাঁর।

দৈত্য শ্রেষ্ঠ শুণ্ড এবং উপশুণ্ড বিনাশের কারণে লোকপিতামহ বিরিঞ্চির আদেশে তাঁর জন্ম হয়েছিল। বিশ্বকর্মা তিল তিল সৌন্দর্যের উপাদানে তাঁকে তৈরী করেছিলেন। প্রথম কল্পে দেবতাদের মাঙ্গল্যে তিনি পদ্মনাভ দেবেশ্বের বিষ্ণুকে পিতারূপে পেয়েছিলেন। তারও বহু পরে, বাদ্যকল্পে উষা রূপিণী তিলোত্তমা বৈকুণ্ঠপতির আরাধনাতে মগ্না ছিলেন, তখন শয়নে জাগরণে এবং নিশিযাপনে শুধুমাত্র কৃষ্ণের কথাই ধ্যান করেছেন।

আরো মনে পড়ে গেল তাঁর, সাহসিক নামধারী বলিরাজ পুত্রকে সাময়িক স্বামী হিসাবে বরণ করেছিলেন তিনি। গন্ধমাদনের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর মুখে কামবিহারিণী হতে হয়েছিল তাঁকে। যদিও তিনি ছিলেন বিষ্ণু উপসিকা। শিশু সাহসিকের সাথে শরীর সংযোজনে বিন্দুমাত্র লজ্জা বা কুণ্ঠা ছিল না তাঁর।

শেষ পর্যন্ত দুর্বাসার চোখের সামনে ধরা পড়ে গিয়ে ছিলেন তাঁরা। সঙ্গমরত নারী পুরুষের নগ্নমূর্তি দেখে ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল দুর্বাসার দুটি আনন। তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন—পরবর্তী জীবনে তিলোত্তমা দানবী যোনি প্রাপ্ত হবে।

এই অভিশাপের কথা পৌঁছে গিয়েছিল বাসুদেবের কানে। তিনি বলেছিলেন—বাণ কন্যা রূপে তুমি দানবী যোনিপ্রাপ্তা হবে। কিন্তু বিষ্ণুর পৌত্রবধূ হিসাবে তাঁর প্রত্যক্ষ বাৎসল্যে অভিষিক্তা হতে হবে তোমাকে।

অতএব আজ ঊষা যে অনিরুদ্ধ পত্নী হয়েছেন, এতো তাঁর গতজন্মের আশীর্বাদ ও অভিশাপের সংমিশ্রণের ফলশ্রুতি।

তিনি বুঝতে পারলেন, এভাবেই তাঁকে বাৎসল্য রসে আরো আপন করে টেনে নেবেন প্রেমিকরাজ বাসুদেব। কখনো দাস্য, কখনো সংগুপ্ত, কখনো প্রেম, এবং কখনো বা বাৎসল্য—এভাবেই তো তিনি পৃথিবীর সমস্ত রূপ কান্তিময় রমণীকে আত্মার আত্মীয়া করে নেন। তাদের সাথে মেতে ওঠেন প্রেম ও কামের এক অন্তহীন খেলাতে।

তাপসী বেদবতী



তখন দেখতে দেখতে চক্রবাল রেখা রক্তিম হয়ে উঠেছে। গগনবলয় হতে তখন নিনাদিত হচ্ছে অপূর্ব ব্রহ্ম সঙ্গীত। সেই রক্তিম আলোক সাড়া জাগাবে পর্বত কন্দরে। ছড়িয়ে পড়বে তা উন্মুক্ত প্রান্তরে। নিস্তব্ধা পৃথিবী মুখরিতা হয়ে উঠবে নবদিবসের জয়গানে। এখন, তারই নীরব প্রস্তুতি চলেছে বোধহয়।

তখন কোথা থেকে শোনা যায় নারীকণ্ঠের করুণ বিধুর কণ্ঠস্বর। ভেঙে যায় শেষ রজনী এবং প্রথম দিবসের মধুর আলাপনের প্রত্যাশী মুহূর্ত। কে এভাবে এমন কথা বলছেন? আর্তকণ্ঠের মর্মান্তিক শোকাচ্ছন্নতা ছড়িয়ে পড়ছে। দূরবার্তা ঘোষিত, হয়েছে চারপাশে। আশ্রম জননীর আবেগ আকুল সতর্ক কণ্ঠস্বর হাহাকার করছে—নেই, কোথাও নেই বেদবতী।

আশ্রম পিতার আদেশে ছুটে গেছেন নিদ্রোত্থিত ঋষি কুমারেরা। তাঁরা বুঝেছেন, এই চীৎকার হলো সেই তিলোত্তমা কুমারীর, বেদবতী যাঁর নাম। বিগত একটি দিবসের লজ্জায় ম্রিয়মানা সেই সুকুমারাঙ্গি রাজকন্যা।

স্পষ্ট শুনতে পেলেন ঋষি দল, আবার চীৎকার করে আশ্রম জননী বলছেন, আশ্রমের কোন স্থানে বেদবতীর চিহ্নমাত্র নেই।

সত্যিই তো, আশ্রমমাতার নিদ্রার সুযোগে তখন সেই আশ্রম পরিত্যাগ করে চলে গেছেন হতভাগ্যা রাজদুহিতা। দুরাত্মা রাক্ষসের হাত থেকে যাঁকে রক্ষা করে কর্তব্য পালনের গর্বে গর্বিত হয়েছিলেন আশ্রমবাসী ঋষিবর্গ। যাঁরা ভেবেছিলেন, আপন পৌরুষের ঔদার্যে এই সহায় সম্বলহীনা তরুণীটির সতীত্ব বজায় রাখবেন, তাঁদের সমস্ত অহঙ্কার এখন ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। মুক্তি লোভাতুরা বিহঙ্গী মত দূর আকাশে ডানা মেলে দিয়েছেন বেদবতী।

ছুটতে থাকেন ঋষি কুমারের দল। কোথায় যাবেন তাঁরা? কোথায় ঘটে গেছে এক দুর্ঘটনা? ঈশান প্রান্তে কি অগ্নিশিখা দেখা দিচ্ছে? সেই আগুনের উদ্যত গ্রাসে কুমারীর বরতনু বোধহয় জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!

ছুটে চললেন ঋষি কুমারের দল। যে করেই হোক, এই অপাপবিদ্ধা রাজাঙ্গনাকে বাঁচাতেই হবে। ভ্রান্তিমতী রাজ-তনয়া যেন এভাবে আত্মঘাতিনী হতে না পারেন, তাহলে যে দুরপনেয় কলঙ্কের ছাপ পড়বে আশ্রমের ওপর, স্বয়ং ঈশ্বরও বোধহয় তা নিশ্চিহ্ন করতে পারবেন না।

সর্বগ্রাসী ঐ অগ্নিশিখা তখন প্রবল বিক্রমে এগিয়ে আসছে। বাতাসকে বাহনরূপে অভিষিক্ত করেছে সে। বিলম্ব কি অনেক হয়ে গেছে? আত্মসমর্পিতা সেই শুচিস্মিতার বরতনু কি এখন পোড়া মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে?

হায় গতকালের জীবন্ত বেদবতী কি আজ গতাসু এক কন্যা?

ঋষি কুমারদের করুণাঘন চক্ষুতে নেমেছে উদগত অশ্রুর ইশারা। সহসা তারা শুনতে পেলেন বাতাস প্রকম্পিত করে উচ্চারিত হয়েছে ঋষিরোষ।

কে যেন শোনাচ্ছে শোকস্তব্ধ মৃত্যুর কাহিনী। বলা হয়েছে, আপন কামনা চরিতার্থতার স্পর্ধায় যার জীবনে এই অনাকাঙ্খিত মৃত্যুর অভিশাপ এনে দেওয়া হয়েছে, সে তার এই জন্মের জীর্ণদেহ পরিবর্তিত করেছে। পরবর্তীকালে, ভিন্নদেহী মহাপ্রকৃতি হিসাবে সে তোমার মৃত্যুর অঙ্গীকার নিয়ে আবার এই পৃথিবীর মাটিতে জন্ম গ্রহণ করবে।

বায়ু-মণ্ডলের স্তরে স্তরে প্রসারিত হচ্ছে ঋষি কণ্ঠের এই অক্ষয় অভিশাপ। শেষ পর্যন্ত তা আঘাত করেছে জলধিপারের এক রাক্ষস নিলয়ের পাষাণ প্রাচীরে। বজ্রময় সেই অভিশাপের ঘাতে কম্পিত হয়ে উঠেছে ত্রিকূটে স্থায়ী রাজপ্রাসাদের পাষাণ হৃদয়। মৃত্যুর প্রথম স্পর্শে বুঝি শিহরিত হয়ে উঠেছে সুকঠিন শিলাস্তম্ভেরা।

* * *

বৃহস্পতি তনয় কুশধ্বজের একমাত্র কন্য রূপবতী বেদবতী। যৌবনের রাজ্যে প্রবেশ করার সাথে সাথে অনন্ত অহঙ্কারে ঐশ্বর্যশালিনী হয়ে ওঠে। রাজপ্রাসাদের পুষ্পোদ্যানে তখন কুসুম বিলাসী প্রজাপতিরা ওড়াওড়ি শুরু করে দিয়েছে। কখনো তারা ভুল করে উড়ে বসে বেদবতীর স্বল্পোন্নত কুচদুটিতে। অথবা তাঁর হাস্যে উজলা রক্তিম দন্ডে। কিম্বা অর্ধশশী জয়ী কপালে।

হাস্যভারে লুটিয়ে পড়ে বেদবতী। কিশোরী সুলভ লজ্জায় আপ্লুতা হয়। তার সুলজ্জিতা আননে ফুটে ওঠে এক অদ্ভুত রাগ।

নিজের পিতৃত্বের দায়িত্বে সচেতন ছিলেন রাজাধিরাজ কুশধ্বজ। রাজ্যে রাজ্যে রাজদূত তিনি পাঠাননি তার কোন রাজনন্দনের সন্ধানে। স্বয়ম্বর সভার জন্যে কোন আহ্বান লিপিও পালন করা হয়নি।

কি ভেবেছিলেন কুশধ্বজ, তিনিই বলতে পারবেন। তবু বারে বারে তাঁকে মন্ত্রণা দিতে এগিয়ে এসেছেন দীর্ঘদর্শী পুরোহিতেরা। রাজাকে তিনি স্মরণ করে দিতে চেয়েছিলেন, কন্যার আসল যৌবনে পতিকেই তার জীবনের কাঙ্খিত পুরুষ হিসাবে বরণ করতে হয়। এভাবে, এক সামাজিক অনুশাসনকে অস্বীকার করলে কুশধ্বজকে হয়তো অভিশাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে।

সত্যাশ্রয়ী কুশধ্বজ এই বাক্যে চমকিত হয়ে উঠেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর আপাত ঔদাসীন্যের আসল কারণ কারো কাছে উপস্থাপিত করতে পারেননি।

মাঝে মাঝে অবশ্য আশা নিরাশায় দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান হতেন তিনি। তিনি ভাবতেন, তাঁর জীবনের সকল পূণ্যের বিনিময়ে তিনি যদি ঈপ্সিত জামাতার হস্তে কন্যাকে উৎসর্গ করতে চান, তাহলে কি তাঁর সেই আশা পূর্ণ হবে না?

তিনি আরো ভাবলেন, যদি সেই স্বপ্ন তাঁর কোন সময় সফল হয়, তাহলে কন্যা বেদবতী লক্ষ্মী স্বরূপা হিসাবে অধিষ্ঠান করবেন।

শেষ পর্যন্ত তাঁর এই আশা দুরাশায় পর্যবসিত হয়েছিল। মনের কোণে জ্বলতে থাকা অতৃপ্ত কামনার শিখা বহ্নিমান রেখেই তিনি নিহত হলেন মহাসুর শুম্ভ দৈত্যের সাথে সংগ্রাম করতে গিয়ে। অতএব, কন্যাকে আর পাত্রস্থ করা হলো না। কুমারী কর্ণকার প্রতি আপন পিতৃ কর্তব্য পালন করার আগেই বিশ্বের মায়া পরিত্যাগ করতে হলো কুশধ্বজকে।

হায়, আমরা কি পরম পুরুষের লীলা জানতে পারি? শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করার আগেই বোধ হয় পিতা ও পুত্রীর দেখা হয়েছিল। সেই দেখাই অক্ষয় হয়ে রইলো রূপবতী বেদবতীর জীবনে। তিনি আর কখনো কোন পুরুষকে তাঁর জীবন দেবতা হিসাবে নির্বাচনের কথা ভাববেন না।

কন্যা বেদবতী— অন্তিম শয়নে শায়িত পিতার চরণ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা কন্যা তখন তাঁর অশ্রু সজল দুটি চোখ মেলে তাকিয়েছেন।

পিতা?

ইঙ্গিতে তাঁকে আরো কাছে ডেকেছেন কুশধ্বজ। শিয়রে বসে তখন নীরবে ক্রন্দন করছেন বেদবতী।

বলেছেন— হায় পিতা, আপনি আমাকে কার হাতে সমর্পণ করছেন? আপনার মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতে আমাকে রক্ষা করবে সে পুরুষ কে আছেন?

ক্রন্দনশীলা পুত্রী বেদবতীর মুখ নিঃসৃত এই বাক্যবাণীতে ঈষৎ হাসির রেখা থরথর করে কেঁপেছে মৃত্যুপথ যাত্রী কুশধ্বজের সমস্ত শরীরে। তিনি বেদবতীর কানে কানে উচ্চারণ করেছেন সেই মহা মন্ত্র, যা শ্রবণ করা মাত্র কুমারী বেদবতীর সর্ব শরীরে কি এক অদ্ভুত শিহরণ জেগেছে। কানে হাত চাপা দিয়েছেন বেদবতী। চীৎকার করে বলেছেন—না, পিতা, এ শব্দ শ্রবণ করাও আমার পক্ষে পাপ। আপনি আর আমাকে প্রলুব্ধ করবেন না।

সহসা মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, কি এমন কথা শুনিয়ে ছিলেন কুশধ্বজ যা শুনে কন্যা এ ধরণের আচরণ প্রকাশ করেছিলেন? কুশধ্বজ বলেছিলেন, এই পৃথিবীতে সমস্ত অবলা নারীর অবলম্বন হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সখা রূপে সর্বত্র বিরাজ করেন। —অসূর্যম্পর্শা রমণীদের আরো বেশী সতীত্ববতী করে তুলতে। হে বেদবতী, তুমি এই কথা স্মরণ রেখো, যখনই বিপদে পড়বে তখন নতমস্তকে চক্ষু নিমীলিত করে তাঁর স্তব করবে। দেখবে, তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন, বিপদভঞ্জন হিসাবে।

এ কি কথা বলছেন পিতা, এই অসম্ভব কি কখনো সম্ভব হবে আমার জীবনে? আমি তো সামান্যা নারী, আমি কি শেষ পর্যন্ত তাঁকে আশ্রয় করতে পারবো?

সংজ্ঞাহীনা হয়ে লুটিয়ে পড়েছেন বেদবতী। সংজ্ঞাকে তিনি সম্পূর্ণবাবে অবলুপ্ত হতে দেননি, তখনো তাঁর অন্তর কেঁপেছে। পিতা বোধহয় আরো কিছু নিবিড় তত্ত্ব এখনই শোনাবেন তাঁকে।

বিশ্বলোকের আলো অস্বচ্ছ হয়ে এসেছে।

পিতা তখনো বলছেন— কেঁপে গেছে কণ্ঠস্বর. তা হাহাকারের মত শোনাচ্ছে—শোন বেদবতী, এই জীবনে মর্ত্যের কোন মানবের উদ্দেশ্যে তোমার স্বতোৎসারিত প্রেম নিবেদন করো না। প্রেমকে একমুখী করো তাকে নিবেদিত করো সর্বেশ্বরের চরণে। তাঁরই হাতে তোমাকে সমর্পিতা করে গেলাম আমি। অসম্ভব নয় কন্যা। আকাঙ্খার মাধ্যমেই তুমি তোমার সাধিত পথের পথিক হতে পারবে। শেষ পর্যন্ত তুমি ঐ ঐশ্বী শক্তিতে আরো বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠো—এই আশীর্বাদ করি।

তাই হোক পিতা। আপনার এই ইচ্ছাই অক্ষয় সিঁদুর হয়ে আমার মস্তকে স্থাপিত থাকুক।

পিতার হাতদুটি ধরে অস্ফুটে এই শব্দকটি উচ্চারণ করেছেন বেদবতী।

কুশধ্বজ আর কোন কথা বলতে পারেন নি। বেদবতী বুঝতে পেরেছেন চিরদিনের মত নীরব হয়ে গেছে তাঁর পিতার কণ্ঠস্বর।

অবিশ্বাস্য ঘটনা। শোক উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে ওঠেননি বেদবতী, জীবনের অনেক ক্রন্দনকে তখন তিনি অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত বহমানা রেখেছেন।

পিতার পাশে বসেই অতি প্রিয় কণ্ঠাভরণ উন্মোচিতা করেছেন। অসংযত করেছেন তাঁর বহু রত্ন রচিত অঙ্গাভরণ। অঙ্গরাগহীনা হয়েছেন প্রসাধন প্রিয়া রাজাঙ্গনা। নীলাঞ্জন পরিশূন্য হয়েছিল তাঁর অপাঙ্গ।

যাঁর হাতে পিতা তাঁকে এইমাত্র সমর্পণ করেছেন, তাঁকে পেতে গেলে এমন ভাবে তাপসীর বেশে সজ্জিতা হতে হবে। এখন থেকে আর অলক্তক রাগ রঞ্জিতা হবে না তাঁর পদ্মসম দুটি পায়ের পাতা। তিনি আর কখনো তাঁর কণ্ঠে ধারণ করবেন না বহুমূল্য রত্নের মালা। তাঁর মুখমণ্ডল আর কখনো চন্দন চর্চিত হবে না। এইভাবে নিরাভরণা এক তাপসী কন্যা হয়ে সর্বদা তিনি পরম ঈশ্বরের ধ্যান করবেন।

শবদহন অগ্নির শেষ ধূমাটুকু বাতাসে মিলিয়ে গেল। শুরু হলো, যৌবনে বিরহিনী এক কন্যার জীবনব্যাপী সাধনার প্রথম প্রহর।

একটির পর একটি দিন কাটতে থাকে। ঋতুচক্রের আবর্তনে বছর নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। যৌবনে বোধহয় ভাঁটার টান লাগে। হায় ঈশ্বর. তুমি আমাকে বলে দাও, কবে আমি তোমাকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করবো? তুমি এসো, এক চিরপ্রেমিক হিসাবে।

এই কাম বিবর্জিতা জীবনে আমি এক কঠিন ব্রত উদযাপনের পথে এগিয়ে চলেছি। যুগধর্মের সু নির্ধারণে পরিবর্তন আসছে আমার দেহে। আমার মনের রূপান্তর ঘটছে।

তবুও আমি ক্ষণকালের জন্যে মৃত্যুপথযাত্রী আমার পিতার কথা বিস্মৃত হইনি। তিনি যে সত্য অহঙ্কারকে আমার সামনে উদ্ভাস করেছিলেন, তা চিরদিন অনির্বাণ দীপশিখা হয়ে জ্বালতে থাকবে।

হায়, বেদবতী বুঝতে পেরেছেন, যে পথের পথিক তাঁকে হতে হয়েছে, সেই পথের সর্বত্র আছে কণ্টকের চিহ্ন। তাঁর শরীর রক্তাক্ত হবে। তবু কি শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মার আত্মীয়ের সাথে মিলিত হতে পারবেন?

কোন কোন সময়ে তিনি দেখতে পান, সাধনার জ্যোতির্ময় আলোক জ্বলে উঠেছে। অন্তশ্রুতির মধ্যে কার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে। প্রেম যৌবনের মোহজাত উদভ্রান্তি নয়। দুটি আত্মার পরম কাঙ্খাজনিত মিলনকেই আমরা দেহাতীত প্রেম বলতে পারি। সেই প্রেম জন্ম থেকে জন্মান্তরে পরিপ্লাবিত হয়। শুধুমাত্র, শারীরিক বাঁধনের দ্বারা তাকে চিরদিন বন্দী করা যায় না।

অন্যমনস্কা বেদবতী আবার নিশ্চিন্তা হয়েছেন। এই সত্যজ্ঞান উপলব্ধ হয়েছে তাঁর। তিনি বিশ্বাস করেছেন, শেষ পর্যন্ত এক তাপসী কন্যা হিসাবে তিনি প্রেমের এই দুরন্ত পথে সফল পথিক হবেন।

ধ্যানাসীনা সাধিকার মত চক্ষু দুটি নিমীলিত করেছেন। অক্ষিপটে আবার এসে দাঁড়িয়েছেন সেই মূর্তি। যে মূর্তিকে নিরন্তর অনুসন্ধান করে চলেছেন ব্রহ্মচারিণী বেদবতী। যে মূর্তির নাম প্রতিনিয়ত স্পন্দিত হচ্ছে তাঁর হৃদয়ের মধ্যে, সেই মূর্তি কি কখনো রক্ত মাংসের অবয়ব ধারণ করবেন না?

কে তিনি? যাঁর মধুর কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করছে?

বেদবতীর সমস্ত হৃদয় তখন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন ঐ বরেণ্য স্বামী সদর্শনে। সৌম্যরূপী গদা তাঁর আয়ুধ। সুদর্শন তাঁর চক্র। পাঞ্চজন্য শঙ্খে আপন সৃষ্টির মহিমা প্রকাশ করতে চাইছেন। নন্দক খড্গে তিনি শাস্তি দেন পাপাচারীকে। কৌস্তভ মুনিকে ধন্য করেছেন তিনি। শ্রীঅঙ্গে স্থাপন করেছেন তাকে। হায়, ঐ অতসী পুষ্প বর্ণ, ঐ কিরীট কুণ্ডল হার কেয়ুরধারী, তাঁকে কি আমি কখনো আমার আত্মার আত্মীয় করতে পারবো না?

ভাবতে ভাবতে অচেতনা হয়ে পড়েন বেদবতী। তিনি কি জানেন, তাঁরই ইচ্ছায় বেদবতীর পথচলা। তিনি আছেন বলে এখনো বেদবতী রক্তমাংসের শরীর নিয়ে এই পৃথিবীতে চলাফেরা করতে পারছেন। তাঁর এক একটি লহমাই বেদবতীর সমস্ত জীবন?

* * *

অবশেষে প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে নতুন একটি ঋতুর আবির্ভাব হয়েছে।

ক্রমে ক্রমে চিত্তবিশুদ্ধির একটির পর একটি স্তর অতিক্রম করে যাচ্ছেন বেদবতী। অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে জন্ম নিয়েছে জ্ঞানশলাকা। সেই জ্ঞানের মধ্যেই উদ্ভাস হয়েছে প্রিয়জনের মুখের প্রতিচ্ছবি।

কালের গহ্বরে কত অতীত চিরতরে হারিয়ে গেছে। নবীনের ওপর পড়েছে প্রবীণতার ছাপ। কালযাত্রার মাধ্যমে জীবনে লেগেছে নতুন স্পন্দন।

কয়েকটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। পরিবর্তনের সাথে সাথে বেদবতী এখন এক নিরহঙ্কার অলঙ্কারে সৌন্দর্য মণ্ডিতা হয়ে উঠেছেন। তাঁর ভ্রূ-মধ্যে তিনি কুমকুম টিপের মত পরিধান করেছেন জয়ের গৌরব টিকা। সুদীর্ঘ তপস্যার অন্তভাগে কি আছে এখন?

ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার আলোকে কি তিনি কখনো উন্মোচিত করতে পারবেন না নিজেকে?

উপল আঘাতে স্রোতে কি তাঁর চলার গতি রুদ্ধ হবে? অচঞ্চল হিমগিরির দিকে ছুটে যাবেন তিনি?

হায়, আর কতকাল আমি এইবাবে তাপসীর মত থেকে শুধু আপনার পদ বন্দনা করবো? আপনি একবার আসুন আমার মানস চোখে। আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে। আমি যে আর পারছি না?

অবশেষে বোধহয় স্বপ্ন সফল হয়েছে বেদবতীর।

এক সকালে তিনি দেখলেন, এক কন্দর্পকান্তি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর আশ্রম কুটিরের সামনে।

সেই পুরুষ প্রশ্ন করে ছিলেন—কে তুমি? বৃথা তপস্যায় নিজেকে এভাবে নিস্পৃহ করছো? কে তুমি সুরম্যা? তোমার পরিচয় জানার অদম্য কৌতূহলে আমার সমস্ত মন ভরে গেছে।

আমি বেদবতী। স্বামী না পেয়েই তাঁকে হারিয়েছি। আবার তাঁকে পাবো বলে এই কৃচ্ছ্র ব্রত উদযাপন করে চলেছি। কিন্তু আপনি কে? কি আপনার পরিচয়?

যুবক হেসেছিলেন। সেই হাসিতে রহস্য এবং রোমাঞ্চ হাত ধরাধরি করে হেঁটে গেছে। তিনি এইভাবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলেন—পুষ্পলোভী মৌমাছির মত আমি নারী সুষমা পান পিয়াসী এক কামতাড়িত যুবক। যে রমণীর অঙ্গনার শোভা আমার দৃষ্টি পথে এসে পড়ে, তাকে অধিকার না করা পর্যন্ত রাতে আমার ঘুম হয় না। তার অঙ্গের উষ্ণতার সাথে নিজের বরতনুকে মিশিয়ে দিতে হবে, তবেই আমি আমার কাঙ্খিত শান্তি পাবো।

শিহরিতা হতে হয়েছে বেদবতীকে। সদ্য আলাপিত এই পুরুষের এই অশালীন উত্তর শুনে। কানে হাত দিয়ে তিনি বলেছেন— হায়, এভাবে নিজের কথা প্রকাশ করছেন? আপনি কি কখনো ভাবেন না, যে নারী আপনাকে দেখে বিরক্তিতে সমস্ত শরীর ঢাকবে, সে কি করে আপনাকে পরম প্রেমাস্পদ হিসাবে গ্রহণ করবে?

সেই যুবক তখনো হাসছেন এক রহস্যময় হাসি। এভাবেই বলতে থাকেন তিনি—আমার সৌভাগ্য অথবা তোমার দুর্ভাগ্য, এমন কোন উদাসীনা নারীর সাথে এখনো পর্যন্ত আমার দেখা হয়নি।

তখন, সাহসিকা বেদবতী বলে দিয়েছেন, তাহলে হে কুমার, যাবার আগে আপনি শুনে যান, আমি হলাম সেই নারী, যে প্রথম দর্শনেই আপনাকে ঘৃণা করেছে।

এমন অভাবনীয় প্রতিবাদ আশা করেননি ঐ যুবক। একবার তিনি তাকালেন আকাশের দিকে। তারপর প্রত্যাখ্যান প্রয়াসিনী তাপসীর তপস্যাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত আবদ্ধ করলেন।

রহস্যময় কণ্ঠে আবার বলে উঠলেন—এখন যদি সবলে আমি এখন তোমাকে আলিঙ্গন করি? তোমার ঐ ওষ্ঠদুটিকে যদি কলুষিত করি চুম্বন পরশে? তাহলে? কিভাবে নিজের কৌমার্যকে রক্ষা করবে হে দুর্বলা নারী?

তাঁর জলন্ত রক্তিম ওষ্ঠে এখন ফুটে উঠেছে বিশ্বজয়ী লোভাতুর হাসি। তারই পাশাপাশি দৃঢ় সংকল্পের রূপরেখা দেখা যাচ্ছে তাঁর সমস্ত তনুবাহারে।

তবুও, সাহসিকা বেদবতী বিন্দুমাত্র চিন্তিতা হয়নি।

তিনি চীৎকার করে বলতে থাকেন— তাহলে ভাববো, আপনি নিজের কামবহ্নিকে নির্বাপিত করার জন্যে এভাবেই জ্বলে উঠেছিলেন দানবের পাপ শক্তিতে।

এবার আর উর্দ্ধাকাশের দিকে তাকাননি ঐ যুবক অতিথি। কিসের অনুসন্ধানে যেন ব্যগ্র এবং উৎকণ্ঠিত হয়েছিল তার অক্ষিগোলক দুটি।

এক মুহূর্ত তিনি কি যেন ভেবেছিলেন। তারপর বেদবতীর চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিলেন।

এখনো মাঝে মধ্যে সেই চকিত পরিচিত যুবকটির কথা মনে পড়ে যায় বেদবতীর। তখন তিনি যে শুধুমাত্র ঘৃণার উৎসারণা ঘোষণা করেন না নয়, ঐ যুবকটির প্রতি কেমন এক নৈকট্য বোধ করেন তিনি। নিজের হৃদয়ের এই আবেগের কথা নিজেই ভালোভাবে বুঝতে পারেন না অসহায় বেদবতী।

মনে প্রশ্ন জাগে তাঁর, যে যুবকটির সাথে স্বল্প পরিচয় সূত্রে, তাঁকে তিনি যথেষ্ট নিন্দা করেছিলেন, সেই যুবক কেন এখন মধ্যরাতের ঘুম কেড়ে নেন? কি আছে তাঁর চরিত্র মাধুর্যে?

তখন মধ্যদিন। খরতপ্ত একটি প্রহর অতিবাহিত হচ্ছে। তপস্বিনী বেদবতীর সামনে এসে দাঁড়ালেন শ্মশ্রু গুম্ফ মণ্ডিত এক সন্ন্যাসী। দেখে মনে হলো, তিনি যেন ত্রিকালজ্ঞ প্রাজ্ঞ এবং পণ্ডিত। তিনি বললেন—হে জননী, এই দ্বিপ্রহরে আমি তোমার কাছে এসেছি এক অতিথি হিসাবে। তুমি কি আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবে না?

আভূমি আনতা হয়ে ঋষিকে প্রণাম প্রজ্ঞাপিত করলেন বেদবতী। তিনি বললেন, আমি কুশধ্বজ দুহিতা বিষ্ণুদাসী। বেদবতী নামেই আমার পরিচয়। আপনি আমার প্রণাম স্বরূপ অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন ঐ ঋষি। তারপর অকম্পিত স্বরে বলে উঠলেন—তোমার বিনয়ে আমি তুষ্ট হয়েছি। সাগ্রহে গ্রহণ করেছি তোমার প্রণতি। এবার ঋষির প্রার্থনা পূর্ণ করে ধন্যা হও তুমি।

ঋষি বাক্য শুনে বেদবতীর চক্ষুগোলক প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। ভগবত সেবার এক অভাবিত সুযোগ এসেছে তাঁর হাতে। তাকে মুঠোবন্দী করতে হবে।

পরবর্তীকালেই তিনি অন্য কি যেন চিন্তা করেন। কি আছে তাঁর? যা দিয়ে তিনি ঐ ঋষিকে তুষ্ট করতে পারেন।

সুস্মিতভাষিণী বেদবতী বলতে থাকেন—হে ঋষি, আমি মুক্ত মেখলা সম্পলা। সামান্য তাপসী। আমি আপনার কোন প্রার্থনা কিভাবে পূরণ করবো বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি কেন আমাকে কঠিনতম পরীক্ষার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন?

তখনো তেমন অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ঐ ঋষি। মনে হচ্ছে, তাঁর দুটি উজ্জ্বল চক্ষু যেন কিসের অনুসন্ধানে রত।

প্রশান্ত স্বরে তিনি বলে ওঠেন— সাধন শেষে আমি সন্তান সৃষ্টি করতে চাইছি। হে শুচিস্মিতা, এভাবেই আমাকে আমার পিতৃ ঋণ শোধ করতে হবে। তোমার কাছে শুধু একটি মাত্র ভিক্ষা আছে আমার। আশা করি তুমি আমাকে বিফল মনোরথ করবে না।

ঋষির বাক্যে কি রহস্য লুকিয়ে আছে, অভিজ্ঞা বেদবতী তা অনুধাবন করতে পেরেছেন। তাঁর সর্ব শরীরে জেগেছে এক অনাস্বাদিত শিহরণ। তিনি দুটি হাত রেখেছেন কানে, ঋষির এই বাক্য যেন তাঁকে শ্রবণ করতে না হয়।

তবুও, কর্ণকুহরকে সম্পূর্ণ আবরিত করার আগেই তিনি শুনতে পেলেন—এই ঋষি বলছেন—আমাকে সুরথ দান করো। আমার অপত্য সৃষ্টির আকাঙ্খাকে ধন্য করো। নিজে ধন্য হও।

বেদবতীর মনে হলো তিনি যেন ভূকম্পনের আঘাতে জর্জরিত। সারা পৃথিবীতে শুরু হয়েছে মহাপ্রলয়। তবুও, ক্ষণকালের জন্যেও তিনি তাঁর সাহস হারালেন না।

দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বলতে থাকলেন—হে ঋষি, আর্যরীতির অনুসারী এই প্রার্থনা, কিন্তু সেই প্রার্থনা পূরণ করার অধিকার আমার নেই। আপনি হয়তো জানেন, আমি শুধুমাত্র এক অনূঢ়া সাধিকা নই—আমি অন্যপূর্বা এক প্রেমিক। পিতা কর্তৃক সম্প্রবক্তা। আমি শুধু তাঁকে পাওয়ার জন্যেই সুকঠিন তপস্যারতা।

সত্যি। চমকে উঠলেন ঋষি। এর আগে এমন কোন কথা শোনেন নি তিনি।

কামপাশে সংবিদ্ধ ঋষি। আর্যপথ বিস্মৃত হয়েছেন। কিভাবে এই তাপসীকে অধিকার করা যেতে পারে, তার জন্যে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকেন।

তিনি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন—হে কন্যা, নির্মম সেই অধীশ্বরকে পাওয়ার অভিলাষে তোমার এই কৃচ্ছ্রব্রতের সাধন? তুমি কি এক মুহূর্তের জন্যে সফল হয়েছো? একবার চোখ বন্ধ করে নিজের অন্তরের দিকে অবলোকন করো তো সুন্দরী। তুমি তো যৌবনভারে অবনীতা। প্রতি মাসে ঋতু দর্শন করতে হয় তোমাকে। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই তুমি কামচঞ্চলা হয়ে ওঠো। একবারও কি তোমার মনে হয় না, কেন কিসের জন্যে তাকে পাবার অভিলাষে তুমি এইভাবে যৌবনে বিরহিনীর ছদ্মবেশে সুসজ্জিতা হয়েছো?

কানে হাত দিয়েছেন বেদবতী। বলছেন তিনি—ঋষি, ব্যর্থ বর্তমানের মধ্যে দিয়েই আমি চলতে চাই। এভাবেই আমি এক অনাগতের দিকে তাকিয়ে আছি। হৃদয়বান ঐ অধীশ্বর একদিন না একদিন আমার কথা শ্রবণ করবেন। তখনই আমার অন্তহীন পথচলা শেষ হবে।

আর বেশীক্ষণ সেখানে থাকতে পারেননি বেদবতী। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এবার বোধহয় তাঁর সংযমের বাঁধ ভেঙে যাবে। ছলে বলে কৌশলে যে করে হোক তাঁকে অধিকার করবেন ঐ ঋষি। অতএব, সেই স্থান অবিলম্বে ত্যাগ করলেন বেদবতী।

আর সেখানে জ্বলন্ত আগুন শিখা হয়ে জ্বলতে থাকলো উজ্জ্বলদেহী সেই জড়া জটাজুটধারী আগন্তুক!

ঋষির বাক্য মাঝে মধ্যেই মনে পড়ে বেদবতীর। আগে কখনো তাঁকে এমনভাবে সংশয়াচ্ছন্ন হতে হতো না। কিন্তু ঋষিবর তো মিথ্যে কিছু বলেননি? দেখতে দেখতে যৌবনের আরক্তিম প্রহর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন বোধহয় প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছেন বেদবতী। আর কতদিন তিনি রজঃস্বলা থাকবেন? এখনো তো পরম কাঙ্খিত চিরপুরুষের সাক্ষাত পাননি।

মনে হচ্ছে তাঁর, এই জীবনে বোধহয় আর কখনো তিনি নরোত্তমের সন্ধান পারেন না। বহুবার অকালে ভেঙে গেছে তাঁর তপস্যার একাগ্রতা, কিন্তু এর আগে কখনো তিনি ভেঙে পড়েননি, মর্ত্যের সন্দেহ টলমল হয়ে উঠেছে। অচলা থেকেছেন বেদবতী তাঁর প্রতিজ্ঞা নিয়ে, দ্বিধাহীন মহাযাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি। সেই যাত্রাপথে মাঝে মধ্যে তাঁকে শঙ্কিত সঙ্কুলা হতে হয়েছে। কিন্তু এমনভাবে কখনো তিনি অভিমানিনী হননি!

ধিক, ধিক আমার তাপসী ব্রত, এভাবে কতদিন আমি এক কুমারী কন্যা হয়ে অবস্থান করবো?

অকস্মাৎ একটি প্রচণ্ড চমকে চমকিত হয়ে উঠলেন অচঞ্চলা সাধিকা। কে যেন সবলে আলিঙ্গিত করেছে তাঁর বরতনু। অতি স্পৃহাশীল সেই পুরুষের তীব্রতায় একাগ্রতায় তাঁর সমস্ত দৃঢ়তা শিথিল হয়ে গেছে। তাঁর ছটি ইন্দ্রিয় সমন্বিত স্নায়ুরাশি শিহরিত হয়ে উঠেছে।

আবার তিনি ফিরে পেয়েছেন সম্বিত। অসহনীয় এক ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে তাঁর দুটি ভ্রূ ফলক। অকালে মেঘাবৃত আকাশের মত মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন কি তিনি?

কে এই পুরুষ? কি তার দুঃসাহস? কেন সে এইভাবে আমাকে আলিঙ্গন করছে? নিজের উন্মত্ত কামনার কাছে আমাকে বন্দিনী করার চেষ্টা করছে?

তখনো কিন্তু ক্রোধে আরক্তিম হয়নি বেদবতীর চক্ষু। এক মুহূর্তে তিনি ঐ পুরুষের সন্নিধান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। তারপর, বলেছিলেন রাগতস্বরে, কে তুমি এভাবে আমার স্বামী লাভের সাধনায় বাধা দিতে এসেছো?

উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়েছিলেন ঐ রাজপুরুষ। তিনি বলেছিলেন—স্বামী হয়েই আমি এসেছি। আমি হলাম সেই দেব দুলর্ভ কান্তি যুবক। যাকে তপস্যালব্ধ অলীক অভিশাপ অগ্নি সন্ত্রাসে প্রতারিত করেছিলে এক উন্মুক্ত আকাশের নীচে। দেখতে এসেছি, তুমি তোমার বল্কলবাসের অন্তরালে কি কাম সঙ্কেত লুকিয়ে রেখেছো?

পৃথিবীর মাটি দুলে উঠেছে। আকাশ ডুবে গেছে মেঘের আক্রমণে। চারপাশের বৃক্ষলতা যেন তাদের আকুল অভিভূত বাহু বিস্তার করেছে।

ভয় পেয়েছেন বেদবতী। জীবনে এই প্রথম ভয় পেয়েছেন তিনি। ব্যভিচার প্রয়াসী ঐ যুবকের চিবুকে তখন জেগেছে কঠিন সঙ্কল্প!

আর নিজেকে রক্ষা করতে পারছেন না বেদবতী। কি যেন ভাবছেন তিনি? তাঁর দেহ এভাবে কলুষিত হবে? কামনা মদিরতায় পৃথিবীর আলোবাতাস এবং জল ইতিমধ্যেই দূষিত হয়ে গেছে। এখন তিনি কি এক কলঙ্কিতা রমণী হিসাবে পরিচিতা হবেন?

চীৎকার করে ওঠেন তিনি—কে আপনি? আপনার আসল পরিচয় এখনই আমার সামনে জ্ঞাত করুন?

সেই যুবক তখনো হেসে চলেছেন। সমস্ত সন্দেহ এবং সন্দেহের কুজ্ঝটিকা অপসারিত হয়ে যায় কি এক নিমেষে?

যুবক বলতে থাকেন—তুমি আমার প্রেম সঞ্জীবনী। আমার কথা শোন। তুমি কেন নিজেকে এইভাবে দূরে রেখেছো?

এবার তপ্ত হয়ে উঠেছে সুবর্ণপিণ্ড, ক্রোধাননা বেদবতীর সমগ্র মুখমণ্ডল আরক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে।

চীৎকার করে ওঠেন সংক্রুদ্ধা বেদবতী—এ সমস্ত কথার অর্থ কি রাজন?

উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়েছেন কামাত্মা পুরুষ। বেদবতীর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর আলিঙ্গন অভিলাষী দুটি বাহু। বলছেন তিনি—এ কথার অর্থ কি সত্যি সত্যি তুমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারোনি?

বেদবতী ভাবতে পারছেন না, কি ঘটতে চলেছে অনতিবিলম্বে, তিনি চোখ বন্ধ করলেন, তিনি ভাবলেন এখনই তাঁকে হয়তো পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় দেবেন শ্রীচরণে।

কই, তিনি আসছেন কই? এলেন না বেদবতীর সেই মনেশ্বর। যাঁর জন্যে তাঁর এই নিরলস আত্মবিড়ম্বনা—অবশেষে তিনিই তাঁকে বিড়ম্বিতা করলেন?

সন্ধ্যার নিস্তব্ধ বাতাস পরিপ্লাবিত হয়ে গেল এক অসহায়া যুবতীর আত্ম হাহাকারে। দ্রবীভূত হুতাশনের মত সজল হয়ে উঠলো তাঁর আঁখি দুটি।

হায়, শেষ পর্যন্ত ঐ দুরাত্মা কামুককে কি তিনি দূরে ঠেলে রাখতে পারলেন না?

অবশেষে সেই রাক্ষস তাঁর পরিচয় জানিয়েছেন। উদগত কণ্ঠস্বরে। তিনি হলেন লঙ্কেশ্বর রাবণ। এভাবেই তো এক উদ্ভিন্না-যৌবনাকে বারে বারে আক্রমণ করেন অশোক কাননে বন্দিনী করবেন বলে।

দেবতার অশেষ অনুগ্রহে তখন সেখানে উপস্থিত হয়েছেন একদল ঋষি কুমার, তাঁদের চোখের সামনে এক তাপস্বী এইভাবে তাঁর সমস্ত সতীত্ব হারাবেন, তা কখনো হতে পারে কি?

শীর্ণকায় ঐ ঋষি কুমারদের দেখে হো হো করে হেসে ওঠেন রাক্ষসরাজ রাবণ। এতো স্পর্ধা লুকিয়ে পাছে দুর্বিনীত তরুণদের তনুবাহারে?

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন দুরাত্মা। বললেন তিনি—জটামণ্ডিত ঐ শির যদি রক্ষা করতে চাও, ঋষি দল, তবে বৃথা কালক্ষয় করো না। বীর্যশুল্কা ঐ বরঙ্গনাকে আমি ভোগ করবো। তোমরা তোমাদের আশ্রমে ফিরে যাও। রাবণের সম্ররোষের উদ্রেক করোনা।

রাবণের অট্টহাস্যে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে বনতল। ধীরে ধীরে সেই হাস্যরস প্রশমিত হয়ে আসে। তখন বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে এক ধমক বাণী।

দূরাত্মা রাক্ষস, তুমি ভেবেছো, চিরদিন এইভাবে পৈশাচিক রাজত্বে রাজকীয় শয্যাতে উপবেশন করবে? এবার দেখো আমাদের শক্তি।

শত কণ্ঠের বিদ্রূপ যেন সহস্র ব্যঙ্গের মত মুখরিত হয়ে ওঠে। দেখা যায়, কি সব ঘটনা ঘটতে চলেছে। অবরুদ্ধ ক্ষোভে তখন রাবণ হো হো করে হেসে উঠেছেন, নাকি কেঁপে উঠেছেন, মনে হচ্ছে মহা শূন্যের অগ্নিরাশি ছুটে আসছে।

দংশনে দংশনে নিষ্পেষিত করে ভীষণ হুঙ্কার দিচ্ছেন। এবার শর যোজিত করার চেষ্টা করছেন। তখনই হঠাৎ অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল রাবণের মুখ মণ্ডল। হাত থেকে সশব্দে পড়ে গেল তীর-ধনুক।

তিনি বুঝি পাষাণ প্রতিমা হয়ে গেছেন। পরমুহূর্তেই তাঁর পাদুকা দুটিও প্রস্তর রূপ ধারণ করলো।

আনত হয়ে এলো একটি মদ-উন্নত শির। কামনা পীড়িত দুটি চোখ শূন্য হয়ে আসে ভিক্ষুক দৃষ্টির ছায়াতে।

ব্যঙ্গের বার্তা প্রবাহিত হয়। লজ্জিত রাবণের লজ্জাতে মেদিনীও বুঝি হেসে উঠেছে।

অবশেষে বেদবতীকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে ফিরে আসেন ঋষি দল। পুলকিত জ্যোৎস্না যেন সাদরে তাঁদের পথের পাশে পাশে জ্বেলে দিয়েছে রৌপ্য শলাকা।

বক্ষমানা উৎকণ্ঠা নিয়ে আশ্রমে অপেক্ষা করছেন বনবাসিনী তাপসীকা।

সাম গানের সুর ভেসে আসছে কানে। ক্লান্ত হয়ে আসছেন বেদবতী। অভিমানের ভারে ভারাক্রান্ত। তিনি বুঝতে পারছেন না, কবে তাঁর এই কঠিন তপস্যা ফলপ্রসু হবে।

আশ্রম পিতা মহাপতির চরণপ্রান্তে বসে আছেন। জানতে চাইছেন সেই শাশ্বত প্রশ্ন—অনুরক্ত জীবনে কেন এই বিরক্তি এলো প্রভু?

স্মিত হেসে বেদবতীকে বক্ষে টেনে নিচ্ছেন ঋষি। স্নেহাভিভূত পিতার মত বলছেন—কন্যা, ফলের জন্যে কোন কাজ করবে না। যখন যে কাজ করবে তখন আসক্তি বর্জিতা হতে হবে তোমাকে, তবেই তো তুমি সত্যিকারের তাপসী হতে পারবে।

ঋষি জানতেন না, সাধন পথের কোন কঠিন মার্গে পদক্ষেপ করেছিলেন বেদবতী। অনাসক্তির বদ্ধ প্রহর কাটিয়েছিলেন। জীবনের সকল আসক্তিকে নির্বিচারে বলিদান করেছিলেন।

চিন্তিতা হলেন তিনি। মন বলছে—এই সাধনায় অবশেষে ফল লাভ হবে তাঁর। কিন্তু কবে? এভাবে আর প্রতীক্ষার প্রহর একা একা অতিবাহিত করতে পারছেন না বেদবতী। তুষাগ্নির মত চিরকাল ধূমায়িত হচ্ছে তাঁর অন্তরের ইচ্ছা!

আর একটি দিনের অবসান হয়ে গেল। শঙ্খচিলের দল উড়ে চলেছে আপন নীড়ের অভিমুখে। নিবিড় অরণ্যের একপাশ থেকে অন্যপাশে ছুটে যাচ্ছে মৃগ।

কবে, কবে আমি আমার ঈপ্সিত পুরুষের সন্ধান পাবো?

সাধিকার নিপীড়িত আকাঙ্খা তখন গুমরে কাঁদছে শিশু সান্ধ্য বাতাসে।

কি যেন হয়ে গেল বেদবতীর? সর্বাঙ্গে তিনি বৃশ্চিকের দংশন অনুভব করলেন। মনে হলো তাঁর, তিনি যেন দাবাগ্নির মধ্যে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছেন।

অন্তহীন পরিতাপের আগুন জ্বলে উঠেছে। কি হবে এই জীবন রেখে? চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে তাঁর। বিপুলা এই অভিভূতি। এতোদিন এমন এক চিন্তামগ্নতায় কখনো আচ্ছন্না হতে হয়নি তাঁকে।

এমন ভাবেই দিন কাটছে বেদবতীর, কোন কিছুই আর ভালো লাগছে না তাঁর। তিনি উপভোগ করতে পারছেন না প্রকৃতির রঙ্গরাজ্যে ঘটে যাওয়া এক-একটি ঘটনাকে। মনে পড়ে যাচ্ছে, মৃত্যুপথযাত্রী পিতার কথা, পিতা যে বলেছিলেন জীবনে অন্তত একবার তিনি তাঁর সাক্ষাত পাবেন?

আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে কোন সে কণ্ঠস্বর তাঁকে আরো বেশী উদ্দীপ্ত করে তুলেছে, কে যেন বলছে— বেদবতী, দেহ কলুষিত হলে মন কলুষিত হয়ে যায়। মন কলুষিত হলে আবার দেহ কলুষিত হয়। তুমি এভাবে কেন নিজের সমস্ত সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছো? অচিরেই তুমি তোমার পরম পুরুষের সাক্ষাত পাবে।

আশ্রম জননী ছুটে এসেছেন, কুমারেরা পরিচর্যা করছেন। মৃত্যুর কোলে কি ঢলে পড়তে চাইছেন বেদবতী? একাকিনী এখন কাটবে তার আত্মপ্রবঞ্চনার প্রহর? নাকি তিনি এই আসন্ন গোধূলি লগ্নে এক দিবাস্বপ্ন দেখবেন? সেই স্বপ্নের মধ্যে তাঁর দেবতা এসে মূর্ত হয়ে দাঁড়াবেন? তাঁর সাথে এব· 'অলৌকিক খেলায় মেতে উঠবেন চিরতাপসী বেদবতী?

* * *

মানুষ যাঁকে মর্মচোখে দেখতে পায় না, যাঁকে দেখতে গেলে এক আশ্চর্য চোখের দরকার, বেদবতী এখন কি সেই দৃষ্টি শক্তিতে উজ্জীবিতা হয়ে উঠেছেন?

বেদবতীর মনে হয় তিনি কে এসে দাঁড়িয়েছেন চোখের সামনে? পালয়িতা বিষ্ণু নন দেবাদিদের মহাদেব নন, স্বর্গলোক প্রীতম; ব্রহ্মা নন, ত্রয়ীর অখণ্ড রূপে মুগ্ধা হলেন বেদবতী, তৃপ্তা হলেন তিনি।

মনে হলো, ঐ বিবর্তিত অখণ্ড ত্রয়ী মূর্তি একটি একক মায়ামূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সপ্তনাগের ছত্রতলে সুশোভিত মহাপদ্মে চরণ অর্পিত শঙ্খচক্র গদা-পদ্ম ধারী বেদবতীর স্বামীর মূর্তিতে। সেই অপরূপ রূপপ্রভার প্রভাবে বেদবতী চেতনাহীনা হয়ে উঠলেন।

তারই মধ্যে উৎকীর্ণা হয়ে উঠেছে তাঁর দুটি কর্ণ। তিনি শুনতে পেলেন, তার সকল বেদনার ধারা তখন মধুরতার পথে এগিয়ে চলেছে।

তোমার চির আকাঙ্খিত মনোরথ সর্বত্যাগের মধ্যে দিয়েই সফল হবে। এসো, সেই ত্যাগের পথ ধরে তুমি আমার কাছে এসো। বেদবতী, তোমার মত এক অভিমানিনীর সান্নিধ্য লাভ করবো বলে আমিও তো উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করে আছি।

বেদবতীর তন্দ্রা ভেঙে যায়। তিনি বুঝতে পারেন না। সত্যি সত্যি কার সাথে দেখা হয়েছিল তাঁর? তিনি কি পুরুষোত্তম কৃষ্ণ?

* * *

তখন একটি শিলাখণ্ডে বসে সদ্য সমাপ্ত এই দিনটির কথা চিন্তা করছিলেন বেদবতী। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে চারদিকে।

কার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল? কে যেন বলছেন— একটি অমূল্য জীবন নিয়ে এই অবকাশ উদ্‌যাপনের চিন্তা ঋষির আশ্রয়ে থেকেও কেন এলো তোমার?

চমকে উঠলেন বেদবতী, অন্তরের গোপনবার্তা কিভাবে বিকশিত হয়েছে ঋষির কাছে? অশ্রুকণা গড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

ঋষি বলতে থাকেন—সহস্র বছর ধরে আমি সাধনা করে চলেছি। আমি জানি না, সেই সাধনার শেষে কি আছে! কিন্তু, আমি দেখছি, তুমি তোমার ভাব তন্ময়তায় আমার মত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যকেও পরাজিত করেছো। আমি বুঝতে পারছি বেদবতী, এই পৃথিবীতে প্রেমের তুল্য আর কিছু নেই।

বেদবতী ক্রন্দনশীলা হয়ে ওঠেন। কাঁদতে কাঁদতেই তিনি তাঁর অন্তরের গোপন কথাটি উপস্থাপিত করেন। তিনি বলতে থাকেন—আপনার আশ্রম আমার একমাত্র শান্তির নিলয়। একথা আমি কোন মতেই অস্বীকার করছি না। কিন্তু, এই মায়াবন্ধন থেকে আমাকে মুক্তি পেতেই হবে। অনন্ত প্রিয়া রেবতীর মত আমাকেও নিজেই পরিবর্তনের সম্বোধনে বরণ করতে হবে পরম কাঙ্খিতকে। এছাড়া আমার আর কোন কিছু চাহিদা নেই।

বেদবতীর মুখ নিঃসৃত এই শব্দগুলি আক্রান্ত করে বৃদ্ধ ঋষিকে। দীর্ঘদিন কন্যা রূপে তিনি বেদবতীকে লালন পালন করেছেন। অথচ আজ বেদবতীকে পরিত্যাগ করতে হবে একাকিনী এবং সঙ্গোপনে? সহসা মনে হলো তাঁর, বেদবতী যখন থাকবেন না, তখন এই আশ্রম বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে।

কিন্তু তিনি কি বেদবতীর মন পরিবর্তনের প্রয়াসে সফল হবেন? তিনি বলতে থাকেন— কন্যা, তুমি কি জানো এইভাবে কোন অঞ্চল পরিত্যাগ করলে পরিশেষে নিদারুণ দুঃস্বপ্নের জগতে বাস করতে হয়?

বৃথাই হাসলেন ঋষিবর। তিনি জানেন, এইভাবে কিছুতেই তিনি বেদবতীর মত এক সাহসিকা রমণীর মন পরিবর্তন করতে পারবেন না।

অবশেষে একদিন সকাল থেকেই বেদবতীর মনটা ভালো নেই। কেবলই মনে হচ্ছে তাঁর,' এই আশ্রমে আর এক মুহূর্ত তিনি অবস্থান করবেন না। আশ্রম বালক এবং আশ্রমকন্যারা যে স্নেহজাল রচনা করেছেন, সেই জাল থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে তিনি প্রাণের সখার সাথে মিলিত হতে পারবেন না। তাঁকে অধিকার করতে হবে দহনতপ্ত অন্ধকারের মধ্যে। বিলাস বা আরামের শয্যাপ্রান্তে শুয়ে শুয়ে এইভাবে আত্মসুখের জগতে ভেসে গেলে চলবে না।

তাহলে? কবে শুরু হবে আমার একক পরিভ্রমণের প্রহর?

কোথায় আছে সেই অন্ধকার জগত? মাটির নীচের বিবর? যেখানে একলা বসে আমি নিভৃত মনে তাঁর সাধনা করবো?

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই আশ্রম অঙ্গন থেকে বিযুক্তা হয়েছেন বেদবতী। সামনে যে পথ চলে গেছে, তার অন্তিমে কি আছে? তা তাকে জানতেই হবে? হাহাকার করে উঠেছেন আশ্রম-মাতা, বেদবতী তাঁর গর্ভজাত কন্যা নন, কিন্তু এই মেয়েটিকে তিনি যে দীর্ঘকাল জননী স্নেহে লালন পালন করেছেন!

যথাসময়ে খবর পেয়ে গেছে বৃদ্ধ ঋষির কানে। তপ ভঙ্গ ঘটে গেছে তাঁর। পাঠিয়েছেন তিনি ঋষিকুমারদের, তোমরা তাড়াতাড়ি যাও। বিপথগামিনী ঐ বালাকে এখনই প্রত্যাগমনের পথ দেখাও। জানি না, ইতিমধ্যে সে কোন সর্বনাশ ঘটিয়েছে কিনা! তখন কার নির্দেশে অরণ্য অভিমুখে ঘটে চলেছে দাবানল। একটির পর একটি বনস্পতি আত্মাহুতি দিচ্ছে সেই অনলের। অন্তহীন উৎসবে। আগুন তখন আকর্ষণ করছে তাপসীর বল্কলখানি। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুন। সেই প্রজ্বলিত অগ্নি শিখার মধ্যে নিজেকে নির্ভয়ে নিঃশেষে সমর্পণ করেছেন অগ্নি কন্যা বেদবতী।

অনতি বিলম্বে সেখানে পৌঁছে গেছেন ঋষিকুমারেরা। তাঁদের বিস্মিত চোখের তারায় ঈশানের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে গেছে। তাঁরা দেখছেন, কোথায় আছেন ঐ নারী যাঁকে যে করেই হোক বাঁচিয়ে দিতে হবে। অগ্নি শিখার উদ্যত গ্রাসে বুঝি তাঁর সুকুমার অঙ্গ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বনশ্রেণীর ঈশান প্রান্তে হেঁটে গেছেন ঋষিকুমারের দল। কিন্তু বৃথা এই অন্বেষণ?

অবশ্যম্ভাবী অবসানের মত শেষ হয়ে আসছে বেদবতীর জীবন। অসহ্য অগ্নিতাপের মধ্যে দিয়েও এগিয়ে আসছেন এক শীতল অন্তক।

আবছা হয়ে আসছে দৃষ্টি। পৃথিবীর সমস্ত স্থাবর এবং জঙ্গম ধীরে ধীরে দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে।

তখন কি তিনি শুনেছিলেন তাঁর কণ্ঠস্বর? দেখে ছিলেন তাঁকে আগুনের সীমাহীন উৎসবের মধ্যে জ্বলে উঠতে?

তিনি কে? তিনি কি ঋষিবেশী অগ্নিময় দেবমূর্তি? তিনি কি সর্বসুখী আগুনভূক?

হায়, আপনার জন্যেই তো আমি আমার জীবনের প্রতিটি প্রহর কাটিয়ে দিয়েছি? হে প্রণম্য, এই আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়েই আমি আপনার বাহুলগ্না হতে চাই।

এসো পবিত্রতমা, আমাকে অধিকার করো। তোমার-আমার মধুর মিলনে পৃথিবীর আকাশ বাতাস পরিপ্লাবিত হোক।

হায় এই মিলন কি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারবো? বেদবতী কোন কথা বলতে পারেন না। তখনো তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে লেগে আছে স্মিত হাসির টুকরো। অকস্মাৎ তিনি দেখতে পেলেন, কোথাও হাসির চিহ্নমাত্র নেই। দেখতে পেলেন তিনি, মুখমণ্ডলে দিব্য জ্যোতির্বলয় নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন শঙ্খ পদ্ম গদাধারী ঐ নারায়ণ। যাঁর কাছে সমস্ত পাপের অন্ত হয়ে যায়। তিনি এ জীবনের সকল জিজ্ঞাসার একমাত্র উত্তর।

পরম প্রাপ্তির আনন্দে বেদবতী আজ সৌরভধন্যা পুষ্পের মত। তাঁর অন্তর পরিপ্লাবিত হয়ে গেছে অনাস্বাদিত আনন্দে। তিনি চোখ বন্ধ করেছেন। মধুর আবেশে ধীরে ধীরে তাঁর সর্বাঙ্গে লেগেছে শিথিলতা। হায় ঈশ্বর, আপনি এভাবে প্রতি মুহূর্তে আমার সাথে খেলেছেন ছলনাময় খেলা? অবশেষে এই অগ্নি পুরুষের ছদ্মবেশে আমার কাছে আসবেন, একথা আগে জানলে আমি তো কবেই অগ্নিকন্যা হয়ে আমার এই রূপ বিসর্জন দিতাম আপনার শ্রীচরণ পদ কমলে!

দেবমাতা অদিতি



এক কঠিন সাধনা শুরু করেছেন অদিতি।

হতে চেয়েছেন তিনি দেবমাতা। বাসব জননী হতে হবে তাঁকে। তাঁকেই আপন গর্ভাশ্রয়ে ধারণ করে অদিতি ধন্য হবেন। সৃষ্টির বৈশালিক বৈচিত্র্য উপলব্ধি করবেন?

স্বর্গ থেকে কেউ কি তাঁকে প্রত্যক্ষ করে হেসে উঠেছেন এক আশ্চর্য হাসিতে? মানব কন্যা অদিতি। তিনি কি শেষ পর্যন্ত দেবজননী হবার এক আপাত অবিশ্বাস্য ইচ্ছার কোরক প্রস্ফুটিত করতে চাইছেন?

কেন এমনটি হয়েছে? কি আছে এই দুর্মর বাসনার অন্তরালে?

সে কথা তো আমাদের জানতেই হবে।

তখন চরাচরে বিধৃত হয়ে উঠেছে এক আশ্চর্য প্রমাদ। পরম যাজ্ঞিক মহাদেষ্ণু বলির কাছে পরাজিত হয়েছেন স্বর্গের অধিপতি শতক্রতু। স্বর্গ রাজ্য থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে তাঁকে। মনে হচ্ছে তাঁর এই জীবনে আর কিছুই বুঝি অবশেষ নেই।

রাজ্য হারা পুত্রের এই সকরুণ ক্রন্দনধ্বনি কি ছুঁয়ে ছিল অদিতিকে?

প্রজাপতি স্বামীর কাছে গম্ভীর বিষণ্ন আননে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—হে স্বামী, রাজ্যভ্রষ্ট আমার সন্তানকে উদ্ধার করার কোন পথ কি আর উন্মুক্ত নেই?

মমতাময়ী সহধর্মিনীর পুত্র মঙ্গলের ব্যর্থ কামনায় হাসি পেয়েছিল কল্যাণ মিত্র কশ্যপের। অনেকদিন ধরে তিনি জানেন, তাঁর পুত্র কে রক্ষা করেছেন। তিনি ছাড়া আর কেউ পুত্রের সীমাহীন ঔদ্ধত্যকে এভাবে মেনে নিতেন না। তারই বিরূপতার কারণে পুত্র আজ দুঃখের কবলে পড়েছে।

স্বগবীর্যের নিরুত্তাপ প্রতিবাদের মতই তাই নিরুত্তর এখন ঐ ঋষি সত্তম।

আবার দক্ষ দুহিতা অদিতি প্রশ্ন করেন—স্বামী, লালসা লাবণ্য পুষ্ট হয়ে যে আমার দুষ্ট চোখের লালিমা কেড়ে নিয়েছে, সেকি শুধু ক্ষণিকের অবচয়?

আরো জানতে চান তিনি—বলো স্বামিন, সেই মিলন বিহ্বল বক্ষ দুটি পুর্ণ করে যে স্রোতরস নির্ঝরিত হয়েছিল, তা কি এইভাবে অপাত্রে দান করা হবে?

সকল জনক-জননীর মত আমরাও কি পুত্রবর লাভে গৌরবান্বিত হতে পারবো না?

তখনো নির্বাক প্রজাপতি। এক অভিজ্ঞানকে স্পর্শ করে আছেন।

বাসব মাতা কাঁদতে থাকেন। অশ্রু সিক্ত তাঁর দুটি চক্ষু, স্বামী সেদিকে দৃকপাত করেন। স্বগতোক্তির মত কিছু বলতে চান।

তিনি বলতে থাকেন—প্রিয়া, এতো অস্থির হয়ে উঠো না। ভেবে দেখো তো, আমি কি এই জাতীয় আপন ভীত সন্তান চেয়েছিলাম?

অদিতির অসংখ্য প্রশ্ন তখন তাঁকে গ্রাস করেছে। এক-একটি প্রশ্নের অন্তস্থিত বাক্যের বিষ বোধহয় তাঁকে নীলকণ্ঠ করে তুলেছে।

বহুবার নিজের হৃদয়ের মানদণ্ডে তিনি নির্মোঘ ভাবে বিচার করতে চেয়েছেন। দেব এবং দৈত্য—উভয়কুল তাঁর পিতৃত্ব মানস থেকে জন্ম নিয়েছে। আজ দেবতার অভিক্ষেপে তিনি কেন ব্যথিত হয়েছন?

তিনি শুধু বসেছেন, অপত্য স্নেহ বড় বিষম জিনিস, অপত্য মানুষকে অন্ধ করে দেয়।

আর বোধহয় তিনি অশ্রু রোধ করতে পারছেন না। এক অদ্ভুত অন্তর্জ্বালায় ক্রমশঃ জর্জরিত হচ্ছেন।

অন্তর্হিত হয়ে যায় সান্ত্বনা বিহীন নির্বাক মুহূর্ত। ভাষাহীন পিতৃত্বের অধিকার পরাজয়ের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছে।

সহসা চমকিত হয়ে ওঠেন কশ্যপ। কি এক আলোক শিখা জ্বলে উঠেছে? ক্ষণিক বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি নিয়ে কে এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন?

অদিতির দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন—আছে প্রিয়া অদিতি, বাসবের সকল ত্রাস অপসারণই শুধু নয়, সর্বজীবনের সমস্ত শুচিতাকে বরণ করার একটি উপায় আছে।

আশার আলো ফুটে উঠেছে বিষণ্ণ অদিতির মুখমণ্ডলে। উৎকণ্ঠিতা হয়ে জানতে চেয়েছেন তিনি সেই পন্থা।

বলো, কেমন করে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকার ফিরে পাবে বাসব? কোন্ সংবিধানে আছে?

কশ্যপ হাসছেন, দেখতে পাচ্ছেন তিনি : তিমিরের একেবারে শেষপ্রান্তে একটি আলোকবিন্দু প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে।

ঐ আলোকবিন্দুকে স্পর্শ করা কি সম্ভব হবে তাঁর পক্ষে?

কশ্যপ বলতে থাকেন—বাহুবলে স্বর্গের অধিকার অর্জন করেনি দানব। বিষ্ণু ভক্তির জন্যই সে দেবলোকের দুর্জয় শাসনভার করায়ত্ত করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, তার এই ভক্তিতে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক নেই। এই ত্রিভুবনে এখন বলির থেকে বলীয়ন আর কেউ নেই। তাই মনে হচ্ছে, আমাদের অন্য কোন পন্থা ধরতে হবে।

আশাহতা দেবমাতার কণ্ঠে তখন উচ্চারিত হচ্ছে হাহাশ্বাস। সত্যিই কি কেউ নেই?

মৃদু হাসেন কশ্যপ, আবার দেখা গেল ঐ ক্ষণিকপ্রভ আলোকবিন্দুটিকে।

একজন আছেন অদিতি, মাত্র একজন!

বিস্ময়ে এবং উল্লাসে তখন চীৎকার করে উঠেছেন অদিতি—বলো বলো সখা, কে সেই মহা পূণ্যশালী মহাশক্তিধর? আমি বক্ষরক্তে অভিসিঞ্চিত করবো তাঁর পদ। বলো কে সেই শক্তিমান?

আবার দেখতে পান কশ্যপ। সেই বাসনাবাহিকা আলোক দীপালিকে।

তিনি হলেন এক মহাসত্য। বেদময় একজন। যিনি মূর্তাকার, সাকার ও নিরাকার এবং নিরাময়। তিনি অলৌকিক চেতন প্রেরণাতে সুজল সুফলা বসুন্ধরা সৃষ্টি করেছেন। রবি প্রভাবে উৎপ্রেক্ষিত হয়ে চলেছেন।

তিনি হলেন, মহাস্রষ্টা নারায়ণ!

দেবমাতা অদিতির দুটি প্রোৎসাহ প্রদীপ্ত অক্ষির আলোকে এখন আশার দ্যোতনা দেখা দিয়েছে। মনে হচ্ছে তাঁর—ঐ ভগবানের পরম করুণা তিনি বোধ হয় লাভ করবেন।

ঋষি বলতে থাকেন—নারায়ণ ভগবান জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য এবং তেজের মূর্ত প্রতীক। যারা তাঁকে পায়, দুঃখাত্মক সংসারের সমস্ত সন্তাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। অদিতি পারবে তুমি, তাঁর চরণ স্পর্শ করতে?

আগ্রহের আকুলতা এবং প্রত্যাশার উদ্বেলতা নিয়ে তখন অদিতি আরো বেশী আকাঙ্খী হয়ে উঠেছেন। তিনি চাইছেন, যে করেই হোক এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। তা না হলে রাজ্যচ্যুত পুত্রের হাতে কিভাবে ঐ বিশাল সাম্রাজ্যের ভার পুনরায় অর্জন করবেন?

অদিতি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন—সর্বজ্ঞানী স্বামী, আমি পারবো। যত কঠিন এই পথ হোক না কেন, সফলতা আমাকে করায়ত্ত করতেই হবে।

ক্ষণকাল চুপ করেন তিনি। স্বামীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। বলতে থাকেন—হে স্বামী, আমার এই বন্ধুর চলার পথে আমি আপনার সাহচর্য পাবো তো?

ঋষি কশ্যপ হাসতে থাকেন দুর্জ্ঞেয় রহস্য ময়তার হাসি। বলতে থাকেন তিনি—অদিতি বিস্মৃত হয়ো না। যে কঠিন কর্তব্য তুমি করতে বলেছো, সেখানে প্রতি পদে তোমাকে নিদারুণ বাধার সম্মুখীন হতে হবে। অসাফল্যের অন্ধকার তোমাকে আবৃত করবে। নৈরাশ্যের বিবরে মুখ ঢাকতে হবে। যদি ঐ সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারো, তবেই তুমি নারায়ণের প্রসাদ লাভ করতে পারবে।

আরো বলতে থাকেন—কশ্যপ, তোমার বক্ষ শোণিতে তাঁকে সিঞ্চিত করতে হবে। কিন্তু অদিতি, বড় ভয় হয়, হয়তো সেই রক্তের শেষ বিন্দুটিও হারিয়ে যাবে। তখনো অসিঞ্চিত থেকে যাবে ঐ মহাত্মার কুঞ্চিত কুন্তলদাম!

এভাবে আপনি আমাকে আর দ্বিধাগ্রস্তা করবেন না। আমি যে একক প্রত্যয়স্থিতি-শীলা হয়ে উঠেছি। আমি অধরপুটে স্থাপন করেছি স্থির আশার স্মিত জ্যোতি। আমার একটি পানি বল্লরীতে আমি স্ফটিক স্বচ্ছ দৃঢ়তাকে স্থাপন করলাম। প্রশ্নহীন উদাসীনতায় এবার আমি অতিক্রম করবো তপস্যার প্রহর।

কশ্যপ ভাবতে থাকেন, এভাবে একদিন পুত্র শোকে শোকাক্রান্তা দৈত্য জননী দিতি বহু বর্ষব্যাপী সাধন শুরু করেছিলেন—শেষ পর্যন্ত তিনি কি সফল হয়েছিলেন তাঁর ঐ অভিযানে? নাকি তাঁকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল?

প্রার্থনা করেন তিনি—অদিতির মনোরথ যেন পূর্ণ হয়। চিরন্তন হোক তাঁর এই অন্তরের আকাঙ্খা।

শুরু হয় এক নারীর মহাপূণ্যময় ত্যাগধন্য সর্বলোক দুর্লভ সাধনা।

অসম্ভাব্য সম্ভাবনার সাধনায় ব্রতী হয়েছেন দেবমাতা অদিতি। বারবার তিনি উচ্চারণ করছেন সেই মন্ত্রধ্বনি— হে সকল সুতের পিতা, তুমি সুতবতী অদিতির সুতরূপে আবির্ভূত হও।

সকল আকাঙ্খার নিবৃত্তি হোক। তোমাকে সন্তান রূপে লাভ করে আমার জীবনের বিভীষিকা অন্তর্হিত হয়ে যাক। মাতৃত্বের অধিকারে ধন্য হোক।

চিতার আগুন জ্বলে উঠেছে পশ্চিম দিগন্তে। একটির পর একটি দিন মৃত্যুর মহাসাগরে নিমজ্জমান হয়ে যাচ্ছে। মধ্য রজনীর মধুরিমা আরো বেশী খুশী হচ্ছে আশার উৎসবে।

হো হো করে হাসছে কালজয়ী মহাকাল। সে কি হিসেব রাখে, কত অদিতি এই ভাবে সন্তান কামনাতে থরথর করে কেঁপে ওঠে? বিফলতার মুঠো মুঠো হাহাশ্বাস ছাড়া আর কিছুই থাকে না তাদের!

বিদ্রুপের ধ্বনি মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে মহাশৈলের শিলায় শিলায়। ব্যর্থতার হুতাশনে মুখ ঢেকেছে পৃথিবী?

একি ভ্রম? একি বিষাদ? একি মায়া? নাকি কল্পনা?

তখনো অদিতি উচ্চারণ করছেন তাঁর অন্তরের মর্মবেদনা। সকল প্রাণের অন্তরালে কে তুমি দাঁড়িয়ে আছো? তুমি আমাকে গ্রহণ করো তোমার মাতা হিসাবে। আমি যেন তোমাকে পুত্রবৎ পালন করতে পারি।

মিলন বিরহের কাহিনী রচিত হচ্ছে। বিকারহীন প্রকৃতি এগিয়ে চলেছে আপন কক্ষপথে। অদিতি বলছেন— সকল সন্তানের মঙ্গল মানসে তোমার মঙ্গল আকাঙ্খা করবো। তুমি কবে অদিতির নারীজীবনের এষণা হিসাবে দেখা দেবে? দেখা দাও প্রভু। আমার মহামাতৃত্বের পীযুষকে ধন্য করো।

ললাটতটে কার অঞ্চুলির চুম্বন? মহাধ্যানে কে উম্মোচিত হয়ে উঠেছে? এক

অসম্ভাব্যকে সম্ভাব্য করতে চাইছেন ঐ সুরনারী? তিনি কি পারবেন? বলছেন তিনি—তোমার মায়াবরণ উন্মুক্ত করে দাও। হে তপোবিষ্ণু মহাতেজা সর্বব্যাপী সর্বস্বরূপ অদ্বিতীয় প্রজ্ঞাবান। তোমার জননী রূপে তোমাকেই দর্শন করার সুবাদে আমাকে ভাগ্যবতী করো।

জাগো জাগো সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমার মহাজাগ্রত শক্তির উন্মীলন ঘটে যাক।

হে যোগীন্দ্র, আমার সকল যোগের পূণ্যফল হিসাবে দেখা দাও। তোমার দর্শন প্রজ্ঞার আলোকে চারপাশ আলোকিত হোক। হে উদ্যমদায়ক উদ্যমকাল, অদিতির সমস্ত উদ্যমতার উপহার তুমি গ্রহণ করো।

অবশেষে সবকিছু যেন পরিবর্তিত হয়ে যায়। ব্যর্থতার দহন নিজেকেই তখন দগ্ধিভূত করছে।

বিস্মিত হতে হয়েছে বিদ্রূপ বিলাসী মানুষকে। মনে হচ্ছে এবার বোধহয় অদিতি তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করতে চাইছেন।

চারপাশে জ্বলে উঠেছে নতুন আলো। সেখানে কাকে প্রত্যক্ষ করলেন তিনি?

কেমন হবে সেই দেবতা পুত্রের অবয়ব? সেই দিগ্বিজয়ীর আয়ু কি দিয়ে তৈরী হবে? তাঁর নাসা কেমন হবে? চিন্তা করতে থাকেন অদিতি। কিছুই আর ভালো লাগছে না তাঁর। তিনি ভাবছেন, অলোকাপুরীর উচ্চতা নিয়ে যেন সমুন্নত থাকে সেই সন্তানের শির। দীপকাননা ধরিত্রী যেন অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁর চরণে। যুগল জানুতে তিনি যেন বিশ্বদেব, কুলকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। তাঁর জঙ্ঘাযুগ যেন সাধ্য সেবিত হতে পারে।

সত্য নিবাসিত হবে তাঁর বাণী। তাঁর রসনাতে পলাশ প্রিয়া বিরাজমানা থাকবেন।

অদিতি হবেন তাঁর গ্রীবা। তাঁর বলিনিচয় সুগঠিত হবে সর্ববিদ্যাতে, ভ্রূ-যুগলে দৃষ্ট হবেন স্বয়ং, যুগল দেবতা—ত্বষ্টা এবং ঊষা। বৈশানর থাকবেন মুখে। প্রজাপতি থাকবেন বৃষণ দ্বয়ে। পরম ব্রহ্মের অধিষ্ঠান হবে তাঁর হৃদয়ে এবং শ্রীময় হবেন তাঁর জনক বিষ্ণু। তাঁর পৃষ্ঠদেশে অষ্টবসু অধিষ্ঠান করবেন। বক্ষস্থল অধিকার করবেন রুদ্র। মহার্ণব সেখানে ধৈর্য রূপে নিবাসিত হবেন। তাঁর উদরে গন্ধর্ব এবং মরুৎগণের অবস্থিতি। সুগঠিত কটিদেশে থাকবে সকল বিদ্যার সমাহার!

এমন এক পুত্র সন্তানের সুখী জননী হয়ে তিনি লাভ করবেন অনাস্বাদিত আনন্দ?

পরক্ষণেই তাঁর মনে হয় যদি এই আশা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ না হয়? তাহলে মিথ্যা হয়ে যাবে তাঁর এই তপস্যা?

দেহগত সকল চেতনার অবসান ঘটে যাবে? থাকবে শুধু হৃদয়ের পরম আকাঙ্খার আবেদন?

অদিতি তখন বারবার উচ্চারণ করছেন বীজমন্ত্র। কিভাবে নারায়ণকে পুত্ররূপে পাওয়া যেতে পারে, তখন সেই চিন্তাতে আচ্ছন্ন হয়েছে তাঁর চেতন?

দেখা কি যাচ্ছে তাঁকে? যাঁর জন্যে এই অবিরাম পথ চেয়ে থাকা?

স্বামীকে আর ভালো লাগছে না বিনতার। পতিসেবার উদ্যোগ আজ অর্থহীন প্রয়াসে পরিণত হয়েছে।

শুধুমাত্র তপ আসনে বসে আছেন অদিতি। উচ্চারণ করছেন বারেবারে, তাঁর অন্তর থেকে নির্গত হচ্ছে একটি মাত্র বাণী।

সেই কথা কি পৌঁছে গেছে বৈকুণ্ঠলোকে উপবেশনকারী নারায়ণের অন্তঃস্থলে? কেন মনে হচ্ছে, চমক জেগেছে কশ্যপের সর্ব শরীরে। তিনি কি দেখতে পাচ্ছেন, একটি আশিবিষ দংশন উদ্যতা? দুটি চোখে তাঁর হিংসা উম্মাদনা?

আর কে এসে দাঁড়িয়েছে। আত্মসম্বরণ করতে হবে কশ্যপকে, তিনি জানেন, একদা এমনই ছিল দেবকুলের প্রেমের শক্তি। তখন ত্রিলোকের সমস্ত হিংসার বিভীষিকার অবসান ঘটে যেতো। আজ অমৃত পুত্রহারা হয়েছে। মহাবলী বলির পূণ্য প্রভাবে নীরব হয়ে গেছে অলকাপুরীর কোলাহল।

মর্ত্যবাসী মানবে এবং স্বর্গবাসী দেবতায় সমস্ত ভেদাভেদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

নীলবর্ণ দুটি হিংসাপীড়িত চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন ঋষি। ব্রহ্ম অভিশাপ ব্যতীত কখনো এই জাতীয় ঘটনা ঘটতে পারে না।

চীৎকার করে উঠলেন কশ্যপ। তাঁর দেহের লোমাবলী খাঁড়া হয়ে উঠলো। তাঁরই অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে পদ্মনাগ এমনভাবে এসে দাঁড়িয়েছে। সে তো তাঁরই সন্তান?

মানসিক শান্তি হারিয়ে ফেলেছেন বিষাদাচ্ছন্ন ঋষি। ভুবন ব্রহ্মার সমস্ত নীতিকে এখন উপেক্ষা করতে হবে।

ভয়ার্ত, বিস্মিত এবং কম্পিত দৃষ্টির সামনে একটি অভাবনীয় অলীকতা এসে দেখা দিয়েছে।

কে দাঁড়িয়ে আছেন? শ্বেত কন্দটের মালা তাঁর গলে? ঋষির বিস্মিত নয়ন সম্পাত সেখানেই স্তব্ধীভূত হয়ে গেল।

পুত্রবিরূপ পিতার অভিশাপ উৎসারিত হবার আগে কি পিতৃঅঙ্গে পুত্রের দংশনও বিফল হয়ে গেছে?

কশ্যপের ইন্দ্রিয় এক অদ্ভুত পুলকে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এই অনুপ্রেরণার সূত্র কোথায়?

দুটি হাতে তিনি তখন ধারণ করেছেন পৃথিবীকে, মনে হচ্ছে তাঁর, একদা তিনি বোধহয় পৌরুষের অধীশ্বর হয়ে উঠেছিলেন---এখন আবার তাঁকে নতুন একটি প্রেমসত্তাকে উজ্জীবিত করতে হবে।

নিদ্রিতা অদিতির ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর উরুক্রম থেকে এখন নতুন এক জীবনের স্পন্দন ধ্বনিত হবে।

স্বপ্ন কি সফল হয়েছে তাঁর? গর্ভসঞ্চার দেখা দিয়েছে অদিতির। এখন মধ্যাহ্ন দিন কেমন আলস্য আকুল হয়ে ওঠে। এখন চোখ বন্ধ করলে তিনি নবজাতকের শরীর স্পর্শ করতে পারেন। হৃৎ-স্পন্দন শুরু হয়ে গেছে তার।

পরম আবেশে চোখ দুটি বন্ধ করলেন অদিতি। অচিরেই এমন এক পুত্র সন্তানের জননী তাঁকে হতে হবে, যিনি হবেন সৃষ্টি স্থিতি এবং বিনাশের একমাত্র অধিকারী!

প্রিয় সখী তুলসী



শঙ্খচূড় পত্নী সতী-আত্মা তুলসী। তাঁর ভাগ্যে চরম বৈধব্যের অভিশাপ বর্ষিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর অঙ্গকেও কলুষিত করেছিলেন স্বয়ং ভগবান কলুষনাশন।

উপাস্যের নির্মমতায় আত্মহারিণী হয়ে গিয়েছিলেন তুলসী। তখন তাঁর চোখদুটি থেকে অবিরাম নির্গত হচ্ছে সজল অশ্রুধারা, জীবনটা আর ভালো লাগছে না। তিনি ভেবেছিলেন, পাষাণ প্রতিমাতে পরিণতা হতে পারলেই বোধহয় এই জীবনের সকল দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটে যাবে।

কিন্তু, কে তাঁকে এই আশীর্বাদ করেছেন? কে বলছেন, হে তুলসী, তুমি হবে মর্ত্যের শ্রেষ্ঠা। তোমার দর্শনে তিরোহিত হবে অখিল সৃষ্টির সমস্ত পাপ। স্পর্শে পবিত্র হবে সৃষ্টি তনু। বন্দনাতে প্রশমিত হবে সমস্ত ব্যথা। তোমার সেবনে যম ভয় বিদূরিত হবে। তোমার রোপণে আমার অধিষ্ঠান। আমার বিগ্রহে তোমার বিন্যাস। যুগে যুগে তুমি এইভাবে আমার ভক্তের শিরে বিধৃতা হবে।

তুলসীর সমস্ত শরীরে এক অদ্ভুত শিহরণ জেগেছে। তিনি ভাবতে থাকেন, হে ঈশ্বর, সত্যি সত্যি আমি কি আপনার অনুরাগ লাভে সমর্থ হবো?

আমি কি হতে পারবো মানুষের দৈব পরিক্রমার অন্যতম উপায়? এক অনিঃশেষ অবলম্বন?

তুলসী ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের মধ্যেই স্বপ্ন দেখেন তিনি। তাঁর পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যায়।

কমলার উপাসনা করেছিলেন হংসধ্বজের দুই পুত্র। সূর্যশাপে তাঁরা হতশ্রী হয়ে উঠেছেন। তাঁদের তপস্যায় তুষ্ট হয়েছিলেন কমলা। ভার্যা যুগলের গর্ভে অবতীর্ণা হবার প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন।

কুশধ্বজের পত্নী মালাবতীর গর্ভে বেদবতী রূপে জন্ম নিয়েছিলেন লক্ষ্মী। পরবর্তীকালে আবার রামরূপী হরিকে পতিরূপে প্রাপ্তা হয়েছিলেন তিনি।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মধ্বজের দুহিতা লক্ষ্মীরই আর এক অংশ; তিনি হলেন তুলসী। তাঁর সৃষ্টির আখ্যায়িকা সাথে তাঁর জীবনের পরিমণ্ডল রহস্যে ঢাকা।

মাধবী এবং ধর্মধ্বজ হলেন লৌকিক বিধান অনুসারে বিবাহিত পত্নী ও পতি।

শুভদিনে শুভলগ্নে ইন্দিরার অংশ স্বরূপিণী মনোহরা পদ্মিনী কন্যাকে মাধবী প্রসব করেছিলেন।

কন্যার পাদপদ্মে পদ্ম চিহ্ন আছে। সঙ্গে আছে রমার ভঙ্গিমা। মহালক্ষ্মীর চিহ্ন সংযুক্তা তিনি। মহা ঐশ্বর্য শালিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রূপে প্রতীয়মানা। সমস্ত নগরীতে তখন শঙ্খধ্বনি হয়েছিল। শরৎকালীন চন্দ্রের মত তাঁর মুখ। তাঁর সমস্ত আচরণের মধ্যে সুকন্যা সুলভ ভাব। পদতল রক্তবর্ণ। নাভি নিম্ন এবং মনোহর। উর্দ্ধভাগে ত্রিবলীর শোভা। বর্তুল নিতম্ব যুগল।

গ্রীষ্মে আরামপ্রদ শীতল গাত্র এবং শীতকালে সুখকর উষ্ণ অবয়ব ছিল তাঁর অঙ্গের আভরণ। তাঁকে দেখামাত্রই তনুবাহারের জ্যোতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যেতো চারপাশে। তিনি ছিলেন শ্বেতচম্পক বর্ণা, শ্যামা এবং সুকেশী। যখন তাঁর জন্ম হলো, তখন নামকরণ করা হলো তুলসী।

রত্নসদৃশা এই কন্যাটিকে পেয়ে খুশী হয়েছিলেন তাঁর পিতা। বলা যেতে পারে—রাজ্যস্থিত সকলের ভাগ্যে দেখা দিয়েছিল নতুন আশা এবং উদ্যম।

দেখতে দেখতে তুলসী বালিকা বয়েসে প্রবেশ করেন। অর্ধোস্ফুট বাক্যে মাতা এবং পিতাকে সম্বোধন করতে থাকেন।

ঝঙ্কৃত হয় কন্যার স্খলিত পাদলগ্ন সুবর্ণ মঞ্জির। সেই ছন্দ ছড়িয়ে পড়ে জনক এবং জননীর হৃদয়ে। তাঁরা কন্যা সম্পর্কিত শুভ কামনারাশি বর্ষণ করতে থাকেন।

বাক পটিয়সী কন্যার কথা যেন বসন্ত সমাগমে কোকিলের কণ্ঠস্বর। নানা বিষয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসেন তিনি। কখনো আবার জটিল দর্শন কথাও বলে দেন।

এই কন্যা এবার যৌবনের স্পর্শে অমোদিনী হয়ে উঠেছে। পাল্টে গেছে তার মনোভাব। কন্যার ভাবী মঙ্গল কিভাবে হতে পারে সেই আশায় এখন বিভোর হয়ে আছেন জনক এবং জননী।

যে বয়সে কিশোরীরা প্রগলভা হয়ে ওঠে, উচ্ছলতা এবং চাটুল্যের এক সংমিশ্রণ দেখা দেয় তাদের আচরণে, সেই বয়েসে তুলসী কিন্তু অতিরিক্ত গম্ভীরা। অনিন্দিতা এবং দুর্জ্জেয় আবরণে আপ্লুতা।

সারাদিন কি যেন চিন্তা করেন তিনি। মনে হয়, তিনি বুঝি এই পৃথিবীর মেয়ে নন। ভুল করে এখানে জন্ম নিয়েছেন।

সেদিন বিষ্ণু মন্দিরে পূজার্থিনী হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন তুলসী। এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। আগেই বেদবতীর দুর্ভোগ সমাচারের কথা শুনেছিলেন তিনি। তথাপি তিনি চেয়েছিলেন, কৃষ্ণকেই তাঁর আরাধ্য দেবতা হিসাবে প্রণাম করতে। প্রতিদিন দুবেলা কৃষ্ণ ভজনের জন্যে মন্দিরে পদক্ষেপ করেন। কুশধ্বজ দুহিতা ভগিনী বেদবতীর কথা মনে পড়ে যায়। শ্রীশ্রী নারায়ণকে পতিরূপে বরণ করতে গিয়ে বেদবতীকে যে নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল তা নিরন্তর ব্যথার সৃষ্টি করে তুলসীর মনে।

তুলসী ভাবতে থাকেন তাম্বুল কিভাবে তিনি নারায়ণকে লাভ করবেন—প্রিয় সখা হিসাবে?

সব কিছু ভুলে যান তিনি। তখন আর প্রসাধনে নিজেকে সজ্জিতা করছেন না। ললাটের মৃগমদ তিলক তখন অবসিত হয়ে গেছে। অধরের তাম্বুলরাগ আর চোখে পড়ছে না। নয়নে আঁকছেন না কাজলের লেখা। চিবুকে যে কস্তুরী বিন্দু মাঝে মধ্যেই সংস্থাপিত করেন, তাও আর দেখা যাচ্ছে না। হস্তপদে আর কমল ধরে রাখছেন না।

প্রসাধনি অনাবৃত হয়ে পড়ে আছে। অব্যবহৃত হয়ে আছে বিভিন্ন জায়ক। গন্ধসারে আর মন ভরছে না তাঁর।

ফিরে যাচ্ছে প্রসাধিকা। সৌরিন্ধ্রীর মনে জমেছে অভিমান। কিসের প্রতীক্ষাতে তিনি এইভাবে বিরহিনীর ছদ্মবেশ ধরেছেন?

সঙ্গীতচর্চা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। সন্ধ্যা সমাগমে তাঁর সহেলীরা এসে তাঁর অলিন্দপথে মিলিত হন। এই রাজপ্রাসাদ থেকে কোন উচ্চকিত হাসির শব্দ শোনা যায় না। নৈঃশব্দ্যের আড়ালে মুখ ঢেকেছে কি রাজপ্রাসাদ?

কি হয়েছে তুলসী তোমার? তুমি কেন গতভূষণা হয়ে গেছো? তুমি কেন কণ্ঠ থেকে খুলে ফেলেছো ইন্দ্রনীল গ্রথিত মুক্তোহারের আবেষ্টন? তোমার কর্ণ কেন কর্ণিকাহীন? ললাটে নেই ললাটিকা? বাহুতে নেই কেয়ুর? অঙ্গুলিতে নেই উর্মিকা? তোমার কটি কেন শব্দবিহীন? তোমাকে দেখলে মনে হয়, তুমি বুঝি এক চলমান শোকবার্তা। এভাবেই এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ করছো—মৃত্যু সংবাদ শোনাবে বলে?

হায় তুলসী, তোমার বিষণ্ণ ক্লান্ত চোখে কিসের ছায়া পড়েছে? তুমি পার্থিবতার উর্দ্ধে অবস্থান করছো। তুমি কেন এতো বেশী অন্তর্মুখিনী হয়ে উঠেছো?

এমন কত কথাই তখন ছুঁড়ে দিচ্ছেন উৎসাহী প্রতিবেশীরা। বয়োজ্যেষ্ঠরা চিন্তিত। যাঁরা বয়েসে ছোট, তাঁরাও ভাবছেন, তুলসীর কি হয়েছে? এইভাবে কেন সে বিরহিনী হয়ে সেজেছে?

তুলসী ভাবতে থাকেন, ভবিষ্যত জীবনে আমার কি হবে? কাকে আমি স্বামী হিসাবে লাভ করবো?

পরক্ষণেই ভাবতে থাকেন তিনি, যিনিই আমার স্বামী হোন না কেন, আমি যে স্বয়ং নারায়ণকে আমার ইহজীবনের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসাবে নির্বাচিত করেছি। তার মানে আমাকে খেলতে হবে দ্বিচারিতার এক খেলা? তাকি উচিত হবে?

তুলসীর দিন কাটছে এখন এক নিদারুণ ব্যর্থতার মধ্যে। কিসের এই ব্যর্থতা?

একদিন দুশ্চিন্তিতা মাধবী প্রশ্ন করেন—তোমার কি হয়েছে কন্যা? কোন কিছু আমার কাছে অকপট রাখবে না। সব এখুনি স্বীকার করো।

তুলসী ধীরে ধীরে উত্তর দেন—মাগো, যে অনির্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হতে হয়েছে আমাকে, আশা করি তাকে তুমি অস্বীকার করবে না।

অপ্রত্যাশিত এই উত্তরে মায়ের মনে জেগেছে আতঙ্ক এবং বিভীষিকা। তবে কি গোপনে রতিলাভ করেছে কন্যা? কুমারী মাতৃত্বের জ্বালা তাকে সহ্য করতে হবে? মৌন প্রক্ষোভ জেগেছে মাধবীর মনের মধ্যে। ভাবছেন তিনি, কে সেই পুরুষ? যার সাথে হৃৎ-বিনিময় করেছে তুলসী? কে তার হৃদয় জয় করেছে? কি তাঁর পরিচয়?

ভাবতে ভাবতে তিনি ভয়ঙ্কর এই প্রশ্নগুলি চাবুক করে ছুঁড়ে দিলেন তুলসীর দিকে। নত মুখ অধোর শির তুলসী উত্তর দেবার চেষ্টা করেন। বলতে থাকেন তিনি— তিনি হলেন সকলের পতি, সমস্ত নারীজাতির একমাত্র উপাস্য, তাঁকে আমি মাঝে মাঝে চোখের সামনে দেখতে পাই। পরমুহূর্তেই তিনি অদৃশ্য হয়ে যান!

কি রহস্য লুকিয়ে আছে এই ক্লেশ আর বিদ্রূপ বিমোহিত বাক্যবাণে?

অভিভূত কণ্ঠে বলতে থাকেন তুলসী—বিচলিত হয়ো না মা। যে ভোগের মধ্যে ব্যাপৃত থেকেও নির্মোহ হতে পারে সেই তো ভোগের ভোগী।

তোমার অপাপবিদ্ধা কুমারী মেয়েটি এখনো তেমনটি আছে। উপযুক্ত স্বামীর সন্ধান পেলে সে নিশ্চয়ই তাকেই জীবন পথের পথিক করবে।

আরো বলতে থাকেন তিনি—মা, আমার জন্যে চিন্তা করোনা। জন্ম মুহূর্ত থেকেই আমি তাঁর পায়ে বলিপ্রদত্তা।

তুলসীর দিকে দৃকপাত করেন মাধবী। ভাবতে থাকেন, হায় ঈশ্বর, শেষ পর্যন্ত আমাকে কিনা জীবনে এতো কষ্ট স্বীকার করতে হবে?

মাধবীর চোখ থেকে সকরুণ অশ্রুধারা নির্গত হয়েছে। তাঁর দিকে তাকিয়ে সকলে স্তব্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে যান।

কিন্তু তুলসী, এই পৃথিবীতে কারো সাধ্য আছে কি, তাঁকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুতা করতে?

কমলা স্বরূপিণী তুলসী এবার হবেন এক কৃচ্ছসাধিনী সাধিকা? সারাদিন বিষ্ণু মন্দিরে পড়ে থাকবেন? আকুল আহ্বানে ডাক দেবেন পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে?

যেমনটি আশঙ্কা করেছিলেন মাতা, ঘটনা তেমনটি ঘটতে থাকলো। মন্দির দাসীর কাছে তিনি সংবাদ পেলেন, সকল বিলাস বৈভবকে হেলায় পরিত্যাগ করে তুলসী এখন জপমালা আর কমণ্ডলু ধারণ করেছেন। কণ্ঠে জপস্ফটিকের মালা। গৈরিক বসনধারী হয়ে তিনি চলে গেছেন সংসার ত্যাগ করে। জগতবাসীর কাছে তাঁর একমাত্র পরিচয়, তিনি হলেন সন্ন্যাসিনী তুলসী!

আকাশ থেকে বোধহয় খসে পড়েছে একটি উল্কা। তার আঘাতে ক্ষণ মুহূর্তে মুর্ছিতা হয়ে গেলেন মাধবী।

তুলসী কোথায় গিয়েছিলেন? কেনই বা গিয়েছিলেন? এসব চিরন্তন প্রশ্নের কোন উত্তর হয় কি? শুরু হয় তাঁর প্রব্রজা। যেমন করেই হোক শ্রীবিষ্ণুকে অধিকার করতেই হবে। তার জন্যে যদি চরমতম দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়, কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা তুলসী তা হাসিমুখে করবেন।

মনে পড়ে যায়, অন্যসব উপাসিকার কথা, শাস্ত্রে লেখা আছে, কৃষ্ণকে লাভ করতে গেলে কি দুঃসহ কঠিন কঠোর তপস্যার আগুন শিখা জ্বালিয়ে রাখতে হয়। তিনি ছলনাময়। তিনি একবার দেখা দেন, পর মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যান। বাতাসের মত তাঁর উপস্থিতি। এই আছেন, ঝড়ের ইঙ্গিতে। আবার মনে হয়, তিনি বুঝি নেই। সমীরণ এতো শান্ত হয়ে গেছে।

কখনো ফলাহার ভোজন করেন তুলসী, কখনো গলিত পত্রে নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন। আবার কখনো শুধুমাত্র বায়ু সেবন করে দিন কাটিয়ে দেন।

হায় তুলসী, এতা দুঃখ যন্ত্রণা আপনি সহ্য করছেন? সত্যি সত্যি কি আপনি কোনদিন সেই প্রার্থিত বস্তুটির সামনে দাঁড়াতে পারবেন?

তুলসী হেসে ওঠেন। অঙ্গে জেগেছে অদ্ভুত পুলক। আরক্ত দুটি নয়ন বারবার কম্পিত হচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা প্রাপ্তা হচ্ছেন তিনি। এই কি প্রেম? ঈশ্বরকে লাভ করার জন্যে এই যে প্রাণ আকুল করা আকুতি—একে কি আমরা মোহ বলতে পারি?

মনকে নিয়ন্ত্রিত করার শিক্ষা পেয়েছেন তুলসী। দেহের প্রতিটি কণাকে কিভাবে তাঁর প্রতি একাত্ম মতি করে তুলতে হয়, সেই কঠিন কঠোর মন্ত্রটিও এখন জেনেছেন তিনি। এতোদিন পর্যন্ত সাধনরীতি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। এখন তাও সযত্নে শিখে নিয়েছেন তুলসী। বিক্ষোভ হৃদয়কে কিভাবে স্বচ্ছ সুন্দর করে তুলতে হয়, সংযমী এবং আত্মনিবেদনী, এক-এক করে তাও শিখে নিচ্ছেন তুলসী।

তাপসিকা তুলসীর শুদ্ধাচার দেখে অবাক হয়ে যান আর্য ঋষিরা, তাঁরা তাঁদের ঔৎসুক্য গোপন করতে পারেন না। কে এইভাবে বিষ্ণু আরতির মধ্যে যৌবনের আরক্তিম প্রহর অতিবাহিত করছেন? ললিত কামনাময়ী এক যুবতী কেন সেজে উঠেছেন সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর ছদ্মবেশে?

তুলসী বলতে থাকেন—হে ঈশ্বর, তোমাকে আমি আমার রতিকারী স্বামী হিসাবে পেতে চাই। তুমি আমার সাথে সুরত ক্রীড়ায় মেতে ওঠো। দেখা দাও। তুলসী-তনুর সমস্ত মৈথুন আকাঙ্খার চরিতার্থতা ঘটে যাক।

তবু কি দেখা মেলে তাঁর? তিনি যে চিরকালের প্রেমিক। প্রেমের কুঞ্জবনে নিরন্তর বাঁশি বাদনে মগ্ন থাকেন।

তাঁর ললাট তটে অঞ্জলির অর্ঘ্য। পরম পুরুষের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করেছেন তিনি। তিনি বলছেন—হে তপবিষ্ণু, অদ্বিতীয় পুরুষাকার, তোমার আলিঙ্গন সুখের জন্যে আমি উৎকণ্ঠিতা হয়ে আছি। তুমি এসো, তুমি কোথায় আছো? বলো সেই কথা?

তোমাতেই ধন্য হোক আমার নয়ন প্রীতি। আমার সঙ্কল্প তোমাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত আমার নিদ্রানাশ ও উম্মাদনা, মুর্ছা এবং মৃত্যু—সবেতেই তুমি এককভাবে অবস্থান করছো। তোমাতেই পরিশেষ হোক আমার নারী জীবনের সকল অভিলাষ এবং পুনর্জন্ম লাভের ইচ্ছা। আমার স্মৃতি এবং গুণকীর্তনে, আমার উদ্বেগ এবং প্রলাপে, আমার প্রেম ও প্রেমহীনতায় তুমি একক সত্তা রূপে বিরাজ করো!

চক্রাকারে একই প্রার্থনা করতে থাকেন তুলসী! এই প্রার্থনা বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে। তিনি বলতে থাকেন—হে আমার প্রাণের সখা, আমাকে শৃঙ্গাররাগে সাজিয়ে দাও। তোমার প্রহ্নন আমাকে পান করতে দাও। তুমি হও আমার আত্মা। আমার ছায়া।

কিন্তু কোথায় তিনি? বিকার আসে। শৃঙ্গার অনুভবে তুলসী মুর্ছিতা হয়ে যান। তাতেও তো আরাধ্য দেবতাকে হৃদয় বন্দী করতে পারছেন না?

তাহলে? বিস্ময় জেগেছে এখন তুলসীর মনে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবার বুঝি উদ্‌গীরণে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেবে। তিনি বলতে থাকেন—তাহলে, সকলে যা বলে তাই কি ঠিক? তুমি এক অলীক মায়া? তুমি কি নিশাবিহারী বাতাস? তোমার কোন অবয়ব নেই?

সেদিন, হঠাৎ বুঝি তুলসী শুনতে পেলেন, কোথায় বেজে উঠেছে দৈববাণী, তোমার বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হবে জীবনসাধনার সিদ্ধিতে।

এবার নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলেন তুলসী—কেমন করে পাবো সেই সিদ্ধি? কোথায় সেই পথ? কে হবে আমার পথ প্রদর্শক?

দৈববানী শোনা গেল—পরিণীতা হও। অনূঢ়া সাধনাকে জীবন বঞ্চনার নামান্তর বলা যেতে পারে। আত্মপ্রবঞ্চক কি কখনো পরম প্রাপ্তির আনন্দে উল্লাসিত হতে পারে?

তুলসী বুঝতে পারলেন, ভাবাবেগের সাথে এবার অধ্যাত্ম চিন্তার মিশ্রণ ঘটাতে হবে। তিনি বলতে থাকেন—প্রভু, পরিণীতা যে হবো, তিনি এলেন কোথায়?

আর কোন উত্তর আসে না। স্তব্ধতার ওড়নাতে মুখ ঢেকেছে প্রকৃতি।

হতাশ হলেন তুলসী, দুটি চোখ থেকে অশ্রুকণা নির্ঝরিত হতে থাকে। নয়ন বন্ধ করেন তিনি। মনে হয়, এইভাবে আর সময় কাটিয়ে কি লাভ? এভাবেই কি তিনি বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব অনুভব করতে পারবেন? যিনি এক সামান্যা রমণীর মন সঞ্জ'ত ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন না, তাঁর প্রতি এতো অনুরাগ রেখে কি লাভ?

চীৎকার করে ওঠেন তিনি—হে ঈশ্বর, আমি তো বিষ্ণুলোকের বাসিনী হতে চাইনি। আমি চির অমরত্বের অঙ্গীকারে নিজেকে উদ্বুদ্ধা করতে চাইনি। শুধু একটিমাত্র প্রার্থনা আছে আমার। সেই প্রার্থনাতে আমি কি সফল হবো না?

তুলসী বুঝতে পারেন, তাঁর যৌবন টলমল দিনে হয়তো ঈপ্সিত বস্তুকে তিনি লাভ করতে পারবেন না। নিজের ভ্রমকে স্বীকার করে নিতে হবে। ভোগকে আরো বেশী কামনাহীন করতে হবে। নির্মোহ হতে হবে। তবেই তিনি বিষ্ণু বিগ্রহের অস্তিত্বকে অনুভব করবেন তাঁর রক্তের প্লাবনে।

চোখ বন্ধ করেন তুলসী। এবার বোধহয় ধীরে ধীরে সেই রূপটি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। তিনি কি দেখতে পাচ্ছেন বিষ্ণুকে? আরো কঠিন কঠোর সাধনা করতে হবে।

স্তব্ধ হয়ে গেলেন তুলসী। প্রার্থিত উত্তর তিনি পেয়ে গেছেন। মৌন আকাশ এবং মন মৈনাক জানিয়ে দিয়েছে।

শুরু হলো তুলসীর কঠিন সাধনা, একটি গিরির নিতম্বদেশে দাঁড়িয়ে। সেখানেই দিন কাটতে থাকে। বাতাস প্রবাহিত হয়। সময় অতিক্রান্ত হতে থাকে। শুধু জেগে থাকে শ্রীপতিকে স্বামী হিসাবে বরণ করার বাসনা।

তুলসীর মনে হয়, এই পৃথিবীতে আর কিছু সত্য নয়। জেগে আছে এক অদ্ভুত ভাগবত প্রেম।

এভাবেই একদিন শীতান্তে উপান্তে দেব গজাননের সামনে এসে দাঁড়ালেন তুলসী।

যদিও কঠিন কঠোর তপস্যায় যৌবনের লালিত্য অনেকখানি হারিয়ে গেছে—কিন্তু তারই পাশাপাশি এক আশ্চর্য পবিত্র শিখায় উদ্ভাসিতা হয়েছেন তুলসী। তাঁকে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন গণেশ। বুঝতে পারেন না তুলসীর মনোরথ। কণ্ঠ থেকে বিস্ময় ঝরে পড়ে—বিজনে একাকিনী কে তুমি? তুমি কি বন্ধ্যা?

মৃত বৎসা? অথবা অভিশপ্তা? বলো, হে রূপময়ী—কি প্রার্থনা তোমার?

গজাননের এই প্রশ্নে স্বাধীন ভর্তৃকা নায়িকার মত প্রগলভা হয়ে গেলেন তুলসী, নতিজ্ঞাপন করলেন। নিজের হৃদয়ের উদ্বেল কামনার কথা জানালেন।

তিনি বললেন—হে বিনায়ক, আমি এক অনূঢ়া। আপনার রূপে মুগ্ধ হয়েছি। আমাকে রতি ভোগ রূপ সুধা রসাস্বাদনের সুযোগ করে দিন।

গজানন চমকিত হয়ে ওঠেন। তাঁর এই কদর্যরূপ? কোন যৌবনবতী কি তাঁকে শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে? এই রূপের জন্যে তিনি ছিলেন নারীর অকাম্যও পরিত্যজ্য! তাহলে? এটা কি তাঁর সিদ্ধি প্রাপ্তির প্রাক-পরীক্ষা? সতীপুত্রের ব্রহ্মচর্যকে অসার্থক করার জন্যে কেউ ছলনা করে ঐ রূপমতী নারীকে প্রেরণ করেছে তাঁর নয়ন সম্মুখে?

সর্তক হতে হলো গণেশকে। নিরীক্ষণ করতে থাকেন তুলসীকে অন্যতর দৃষ্টিতে।

বলতে থাকেন তিনি—হে কন্যা, অন্য প্রার্থনা ব্যক্ত করো। আমার আশীষে তা পূর্ণ হবে। তুমি তো জানো, আমি ব্রহ্মচর্যের প্রতীক। আমি কি করে তোমরা রতিরঙ্গ অভিলাষের সঙ্গী হবো?

—আমি ধর্মধ্বজ দুহিতা তুলসী। এছাড়া তো আমার আর কোন প্রার্থনা নেই। একটিমাত্র কামনা আছে। আপনার স্পর্শে আমার কুমারী জীবনের ব্রত যেন ভঙ্গ হয়।

তুলসীকে এইভাবে আরো বেশী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠতে দেখে গজানন আত্ম সচেতন হয়ে ওঠেন।

তিনি বলতে থাকেন—হায় তুলসী, তুমি কি সাবিত্রীর মত প্রশংসিত রূপা হতে চাও? অথবা ভারতীর মত কলাভিজ্ঞা? মনে করলে তুমি বেদবতীর মত ধৃতব্রতা হতে পার। কিংবা লক্ষ্মীর মত গুণশালিনী। চন্দ্রিকার মত মনোরমা অথবা রবিপ্রভার মত

কান্তিশালিনী। আমার জননীর মত মঙ্গালাময়ী অথবা দেবমাতার মত সুপ্রভা। তাহলে এখনই ব্যক্ত করো। তোমার মনোস্কাম অচিরে পূর্ণ হবে।

এতোক্ষণ তুলসী নীরবে শুনছিলেন গজাননের ভাষণ। এবার হেসে উঠলেন। বুঝি চঞ্চলা তটিনীর কলহাস্য।

গর্বিত বাক্যে বলতে থাকেন—হে গজানন, আমি কিছুই চাইনা। আমি এক নগণ্যতমা মর্ত্যবাসিনী। আমাকে মিছিমিছি কেন স্বর্গের অনন্ত বৈভবের লোভ দেখাচ্ছেন? যৌন লুব্ধাতেই আমি আপনার অনুরাগিতা হয়েছি। আপনি অনুগ্রহ করে আমার অন্তরের এই জ্বালা নির্বাপণ করুণ।

গণেশ এবার সত্যি সত্যি শিহরিত হয়ে উঠলেন। বুঝতে পারলেন না তিনি, এখন কি তাঁর করা উচিত?

তবুও, বলতে থাকেন তিনি—হে সুন্দরী, এখনই এই বাসনার তীর তুমি তোমার তূণে তুলে নাও। আমি কিছুতেই তোমার এই কামনার প্রশান্তি ঘটাতে পারবে না।

জ্বলে উঠেছেন তুলসী, তিনি এবার বোধহয় অভিশাপ বর্ষণ করবেন। তিনি বললেন—ধিক নিবীর্য উমেশনন্দন। তোমার ঐ ব্রহ্মচর্যের অহঙ্কারকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি। আমি অভিশাপ দিলাম, একদিন তোমাকে ঐ ব্রহ্মচর্য ভাঙতে হবে। বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে।

সামান্য এক মানবীর মুখ থেকে উৎসারিত এই অভিশাপ বাণী শুনে ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকেন গজানন। তিনি তাঁর স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেন। তিনি চীৎকার করে বলতে থাকেন—হে স্বৈরিণী, নিঃশঙ্কিনী, তোমারও জীবনে এক ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত ঘটে যাবে। তুমি অসুরপতি লাভ করবে। এভাবে অভিধর্ষিতা হবে তোমার বাসনা।

গণেশের মুখ থেকে উৎসারিত এই বাক্য বাণেও বিন্দুমাত্র বিচলিতা হলেন না তুলসী। গণেশের ঐ অভিশাপকে তিনি আশীর্বাদ স্বরূপ গ্রহণ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, দেবতাকে যখন পতি হিসাবে পেলেন না তখন অসুরকেই তাঁর ইহজীবন এবং পরজীবনের সঙ্গী করে নেবেন। অসুর আর দেবতার মধ্যে গুণগত পার্থক্য ছাড়া, আর কোন তফাত আছে কি?

বিষ্ণুর চরণাশ্রিত তুলসীর মনে তখন এক অদ্ভুত ভাবান্তর দেখা দিয়েছে। অনেক দুর্বার দ্রোহ তিনি জমিয়ে রেখেছিলেন তার মনের মধ্যে, অনেক দুরন্ত বিদ্বেষ। এবার কালো শুকুন হয়ে উড়ে যাবে আকাশে। তবুও, কোন অভিমান কি তাঁর স্ফুরিত কণ্ঠস্বর থেকে ধ্বনিত হয়?

তখন এক অবিবেচকী খেলা খেলতে হবে তুলসীকে। তিনি বুঝতে পারছেন না, ক্রমশঃ কেন লুপ্ত হচ্ছে তাঁর চেতনা। তাঁর চিত্তস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে।

একদিন, তুলসী প্রত্যক্ষ করলেন, সুঠাম দেহী ঋষি যুবাকে। বিন্দুমাত্র বিস্মিতা হলেন না তিনি। কেননা, এখন যেখানে তাঁর বসবাস, সেই পুষ্করতীর্থে এভাবে ঋষিকুমার

আসতেই পারেন। নিজের ভ্রূরু দুটিতে অসংখ্য প্রশ্নের ইশারা এনে তুলসী তাকিয়ে থাকলেন ঐ ঋষি কুমারের দিকে। হায় ঈশ্বর, কিসের ধ্যানে তন্ময় হয়ে আছেন ঐ পুরুষ।

প্রথম দর্শনেই প্রেম নিবেদনের এক অতৃপ্ত আকাঙ্খা জেগে উঠেছে তুলসীর মনের ভেতর। কিন্তু দয়িত যদি তাঁর দিকে দৃকপাত না করেন তাহলে কেমন করে হৃদয়ের এই ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে?

দেখা হয়ে গেল কি? চার চোখের মিলন?

সাহসিকা তুলসী অনতিবিলম্বে তুলে দিলেন তাঁর প্রশ্নবাণ—তুমি কে? কন্দর্পকান্তি সুপুরুষ? এখনই তোমার পরিচয় জ্ঞাপন করো।

ঋষি কুমার বলতে থাকেন—তুমি কি ধর্মধ্বজ দুহিতা? বিষ্ণু উপাসিকা?

ক্ষণ মুহূর্তে তুলসীর মুখ-মণ্ডলের রঙ পরিবর্তিত হয়ে যায়। আরক্তিম বর্ণ ধারণ করে তা। তিনি যে বিষ্ণু দ্রোহিনী হয়েছেন।

তবুও, সেই মুহূর্তে তাঁর হৃদয়ের এই পরিবর্তনের কথা জ্ঞাপন করেন না। বলতে থাকেন—হ্যাঁ, আমি বিষ্ণুর কৃপা অভিলাষিণী। কিন্তু, আমারও বড় জানতে ইচ্ছে জাগে ঋষি কুমার, আপনিও কি সেই গরুড়ধ্বজ মহাদেবতার জন্যে প্রার্থনা করছেন?

ঋষি বলতে থাকেন—আমার দেবতা বিষ্ণুর চেয়েও মহীয়ান। তিনি হলেন মহেশ্বর।

বিষ্ণু নিন্দা শ্রবণে অপরিতোষের আলোড়ন জাগে তুলসীর অন্তর্লোকে। অস্থির প্রতিবাদিনীর মত মুখরা হয়ে ওঠেন তিনি। বলতে থাকেন—কি বলছেন আপনি? এইভাবে কি দেবতাদের মধ্যে বিভেদ-বিভাজন করা যেতে পারে? যাঁকে আমি মনে মনে আমার পতিরূপে বরণ করেছি, তিনি তাঁর কেশ পাশে শিখিপুচ্ছ ধারণ করেন, তিনি লক্ষ্মীবল্লভ, তিনি মধ্যাহ্নের সূর্যের তেজে তেজীয়ান, বর্ষণ উন্মুখ জলধরের মত তাঁর বর্ণ। অঙ্গে তিনি অসংখ্য অলঙ্কার ধারণ করেছেন।

ঋষিকুমার তখন শিবের মহিমা প্রকাশ করছেন এইভাবে, তিনি হলেন নগেন্দ্র। হস্তে তাঁর ত্রিশূল। কুঠার মৃগচর্ম অভয়। তিনি অসীমা শক্তির স্বামী। ব্যাঘ্রছাল পরিহিত রসনায়ক। সমগ্র সৃষ্টি ও অসৃষ্টির বিষয়ক ও বিধাতা।

অনেকক্ষণ ধরে তাঁরা এইভাবে শব্দের এক শেষহীন খেলাতে মেতে উঠেছিলেন, অবশেষে ঐ ঋষি কুমারের মুখ নিঃসৃত অধ্যাত্ম বাণী শ্রবণ করে স্তব্ধা হতে হলো তুলসীকে। বেচারী তুলসী বুঝতে পারলেন, ভাবাবেগের প্লাবনে যতই তিনি ভাসমান হোন না কেন, অনেক কঠিন শব্দের মানে এখনো তিনি জানেন না। অবশেষে পরাজয় স্বীকার করলেন তিনি। এবং ঐ ঋষিকুমার নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করলেন এইভাবে।

—আমি শঙ্খচূড়। তনু বংশোদ্ভব। হে নারী, তুমি কি জানো, আমি অমর নিচয়ে অবদ্ধ অজেয়রূপে ব্রীত। মহামহিম আমাতে নিষ্ফল হবে না তোমার অঙ্গদানের ব্রত।

বিস্ময়ে বিস্মিতা হয়ে যাওয়ায় শিহরণটুকুও বুঝি হারিয়ে ফেলেছিলেন তুলসী। এবার আনন্দের পালা। এতোদিন তিনি নারায়ণ প্রিয় গণেশেব সুরশক্তির সার্থক শত্রুর সন্ধান পেয়েছেন। আর্যবৈরী এক পুরুষকে পতি হিসাবে বরণ করার যে সুপ্ত ইচ্ছা তাঁর মনের মধ্যে জেগেছিল, সেই আকাঙ্খা এবার পূর্ণ হবে।

তিনি কি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবেন? অস্থির উত্তেজনায় তখন থরথর করে কেঁপে উঠেছেন তুলসী।

কে এই শঙ্খচূড়? এমন ঋষি সদৃশ চেহারা যাঁর? মনে হচ্ছে তুলসীর, শঙ্খচূড়ের মধ্যে স্বর্গের সমস্ত দেবতার সম্মিলিত শক্তির মিলন ঘটে গেছে।

মুগ্ধ কণ্ঠে তুলসী বলতে থাকেন—হে অসুরপুত্র এতোক্ষণ আমি আমার আসল পরিচয়কে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমি বিষ্ণুপ্রিয়া নই। আমি বিষ্ণু বিদ্বেষিণী।

কুটিল হাসি ফুটে উঠেছে শঙ্খচূড়ের ওষ্ঠে। তিনিও নিজের পরিচয় দিলেন এইভাবে—আমি শিবের উপাসক নই। আমি শিবদ্রোহী।

দুজনে এবার আরো কাছাকাছি এসে গেছেন। তবুও, কেন যেন আরো একটু আশঙ্কা জেগে আছে তুলসীর মনের মধ্যে? তুলসী বলতে থাকেন, হে কুমার, আমাকে পত্নী হিসাবে বরণ করার পর আপনি কোনদিন পরিতাপের আগুনে দগ্ধ হবেন না তো?

শঙ্খচূড় হেসে ওঠেন। তিনি বলতে থাকেন—তোমার মত এক অনন্যা রমণী রত্নের জন্য আমি এতোদিন নীরবে আপেক্ষা করেছি। এখানে অনুতাপ বা পরিতাপের প্রশ্ন আসে কোথায়?

আরো প্রাঞ্জল করে দেন তিনি তাঁর মনোগত বাসনা—হে প্রিয়া শিরীষের পল্লবের সাথে তোমার কি পরিচয় হয়েছে? আপাতত অতি কোমল কিন্তু বৃন্ত কঠিন। বাইরের অবয়বে তুমি যতই কোমলা, তোমার হৃদয় ততই কঠিন। কঠিন হৃদয় শঙ্খচূড়ের ভাবী পত্নী ঠিক এমনটি হবে, এটাই ছিল আমার সুদীর্ঘ কালের অভিলাষ। তবে এরই পাশাপাশি একটি প্রতিশ্রুতি করতে হবে তোমাকে। উদগ্রীবা হয়ে ওঠেন তুলসী—বলুন, কি প্রতিশ্রুতি?

প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, দেবলোকের নিধন ব্রতে তুমি আমার সহায়িকা হবে। এই মহাক্ষেত্রের আদি অধিবাসী অসুরদের অন্যায়ভাবে নিপীড়িত করে দেবলোক গড়ে তোলা হয়েছে। আমি ঐ কামুক সুরদলকে অবিলম্বে হত্যার জগতে পাঠিয়ে দেবো। এই কাজেও তুমি আমার সহায়িনী হবে। কোনদিন কারো প্ররোচনায় অথবা দুর্বলতায় তুমি দেবতার পক্ষপাতী হবে না।

এবার বোধহয় বিবেকের ডাকে সাড়া দিতে হবে তুলসীকে। তিনি চোখ বন্ধ করেন। বিষ্ণুর ক্ষমাঘন মূর্তিটি ক্ষণমুহূর্ত ভেসে ওঠে। তারপর হারিয়ে যায়।

তিনি বলেন—আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।

শঙ্খচূড় বলতে থাকেন—হে কন্যা, আমি বিশ্বাস করি, তোমার সতীত্বই হলো আমাব পরমায়ুর অঙ্গীকার। সুতরাং, স্বামীর জীবন কামনাতে তুমি তোমার এই কথা রাখবে অনন্তদিন ধরে!

তুলসী বলেন—স্বামী, আপনার সাথে আমার চিরদিন এই মিলন চলতে থাকবে। আমি পতিহিত ব্রতে অবিচলিতা থাকবো। তবে আমারও একটি প্রার্থনা আছে?

—বলো, তোমার কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ থাকবে না?

তখন শঙ্খচূড় হেসে উঠেছেন—ঠিক আছে, তুমি তোমার গণেশ বিদ্বেষের আগুনশিখা চিরদিন এভাবেই প্রজ্বলিত রাখতে পারবে।

এবার আর কোন বাধা নেই। তাঁরা স্নান করলেন। মিলিত হলেন তুলসী শঙ্খচূড়ের সাথে। মনে হলো, শত শতাব্দীর ঘন অমানিশার সাথে বুঝি জ্যোতিষ্মতী উষার মিলন ঘটে গেছে।

আহা এমন রূপ? কোন মানুষের সৃষ্টি কি? আদর করে তিনি অসংখ্য অলঙ্কারে সুসজ্জিতা করলেন তুলসীকে। দিলেন রোহিনীর কুণ্ডল। রতির রত্ন অঙ্গুরীয়। বিশ্বকর্মার দ্বারা সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

আপন হাতে নির্মাণ করলেন তুলসীর করবীভার। বিন্যস্ত করলেন তাঁর গলার মালা, রচনা করলেন চন্দ্রলেখা যুক্ত পত্র-দেয়। কপালে আঁকলেন কুমকুম চিহ্ন। তাঁর ললাটদেশে প্রদান করলেন প্রদীপ কণিকার মত সিন্দুর বিন্দু। পাদযুগলে বিন্যস্ত করলেন অলকক্তক রাগ।

এবার, আরো বেশী অভিলাষিণী মনে হচ্ছে কি তুলসীকে? এমন নারীর সাথে নিত্য নতুন রতিক্রিয়াতে মেতে উঠতে হয়। শৃঙ্গার রসে আপ্লুতা তুলসী আবেগের চোখ দুটি বন্ধ করেছেন। কামশাস্ত্রে যতগুলি আসনের কথা বলা হয়েছে, তার সবকটিকে এবার ব্যবহারিক প্রয়োগে পরিস্ফুটিত করতে হবে।

শুরু হলো অন্তহীন মিথুন। কখনো মলয় পর্বতে, কখনো অরণ্যের অভ্যন্তরে, কখনো বা রম্যস্থানের নির্জন পুষ্প উদ্যানে। অবিরত রতি বিহারে মগ্ন থাকলেন তাঁরা।

কেটে গেল ঋতুবৈচিত্র্য। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা।

তবুও, শেষ হচ্ছে না শরীরের এই শেষহীন খেলা। তাঁরা সর্বদা একাঙ্গ হয়ে থাকেন। প্রেমরসে বিভোর। সুধারসে পরিব্যপ্ত। কখনো তন্দ্রা যুক্ত। কখনো উত্তেজনায় আপ্লুত।

শেষ অব্দি একদিন শঙ্খচূড়কে প্রশ্ন করলেন তুলসী—ভয় হয় স্বামী?

—কিসের ভয়?

—মনে হচ্ছে এইভাবে আপনাকে সুরথ কর্মে আটকে রেখে আমি বোধহয় ভাঙতে চলেছি আপনার মহৎ উদ্দেশ্য। আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, দেবলোককে নিশ্চিহ্ন করবেন, তার কি হবে?

চমকিত হয়ে ওঠেন শঙ্খচূড়। সত্যিই তো, এইভাবে এক রমণীর সাথে নিরন্তর বিহারে মগ্ন থাকার জন্য তো জন্ম হয়নি তাঁর! শপথের আগুনকে আরো বেশী প্রজ্বলিত করতে হবে।

শুরু হয় শঙ্খচূড়ের অভিযান। দেবতাদের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হতে থাকে অগ্নিবাণ। তিনি বুঝতে পারেন, তপঃশক্তির বলেই দেবতারা অসুরদের ওপর রাজত্ব করছে। তাই এই শক্তিকে অধিকার করতে হবে।

দীর্ঘদিন ধরে তপস্যা করেই তিনি বোধহয় ঋষির মত এক পতিব্রতা সাধ্বীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। এবার তাঁকে অন্যতর তপস্যা করতে হবে। দেখতে হবে, কি করে দৈবীশক্তিতে শক্তিশালী হওয়া যেতে পারে।

শুরু হয় শঙ্খচূড়ের অভিযান। পরাজিত হলেন অরুণবাহিত রবি। গজবাহিত সুরেশ্বরের পরাজয় ঘটে গেল। এমন কি কপোত। আরূঢ় পবন ও মহিষবাহন অন্তক, কুবের ও চন্দ্রের পরাজয় ঘটলো। অগ্নি এবং বরুণ পরাজিত হলেন। কার্তিক আর মঙ্গল সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। বুধ ও বৃহস্পতি হেরে গেলেন। এবার, কার পালা? সকলেই তো এখন পরাজয়ের জ্বালায় ছটফট করছেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শঙ্খচূড়ের নগর। মহেন্দ্র ভবনের থেকেও অনেক উৎকৃষ্ট। দশ যোজন ব্যাপী বিস্তারিত। সাতটি দুর্লঙ্ঘ্য পরিখায় বেষ্টিত।

শঙ্খচূড় এই নগরের নামকরণ করেছেন দুর্গ নগরী। তুলসীর ইচ্ছাতে এবং শঙ্খচূড়ের অনুপ্রেরণাতে। এই শহরকে শ্রীমণ্ডিত করা হলো।

শেষ পর্যন্ত মাতৃত্বের আশীসে ধন্যা হলেন তুলসী। তাঁর ক্রোড়ে জাত হলো শঙ্খচূড় নন্দন সুচন্দ্র।

অসুর-রীতি শিক্ষা থেকে অঙ্গজকে সরিয়ে রাখেন নবসূতিকা মাতা। অসুরের সুর-বৈরীতার সংবাদ সঙ্গোপন করে রাখেন।

রাজনন্দনের সকল পরিচর্যার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন।

নিভৃতে তাকে বেদপাঠ করান। পুত্রস্মৃতি আবরিত করেন বিষ্ণু স্তোত্রে। শিব বন্দনায় তার মন ভরিয়ে দেন। ব্রহ্মার স্তব সঙ্গীতে পুত্র কণ্ঠ সুরায়িত করেন।

সবকিছু বুঝতে পারেন শঙ্খচূড়। তবুও কোন প্রতিবাদ করেন না। তুলসীর কি উদ্দেশ্য? তা জানতে ইচ্ছে হয়। তুলসী কি এই আসুরিক ঔদ্ধত্যকে পছন্দ করছেন না? তুলসী কি জানেন, একদিন ঐ স্পর্ধার অবসান ঘটে যাবে। আবার তখন দেবতাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

চিন্তা করতে থাকেন শঙ্খচূড়। শেষ পর্যন্ত সুচন্দ্রই কি আমার নাশক হয়ে দাঁড়াবে?

দানব সম্রাট দেবতা ত্রাস শঙ্খচূড়ের মনের মধ্যে সংশয়ের বিষ ঢুকে পড়েছে। তিনি ভাবতেও পারছেন না, সতীর সত্যাবরণ কি এখন ছিদ্রিত হয়ে গেছে?

স্বামীর কাছে কোন কিছু গোপন করেন না তুলসী। শেষ পর্যন্ত স্বামীর কাছেই তিনি অকপটে উচ্চারণ করেন শাশ্বত বাণী—আমার সতীত্বের ক্ষমতায় অমর তুমি দানবেশ্বর। পুত্রকেও আমি মরণ রহিত এক দিব্যাতীত জীবনের অঙ্গীকারে ধন্য করতে চাই।

অসুররাজ নিজের ভুল বুঝতে পারেন। সপ্রেমে তুলসীকে কাছে টেনে নেন এবং বলেন—তোমার এই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি প্রিয়ে।

বৈকুণ্ঠলোকে তখন একটির পর একটি পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে। কিভাবে ঐ বিধ্বংসী দানবকে পরাজিত করা যেতে পারে, তারই আলোচনা চলেছে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো দেবাদিদেব মহাদেবের সাথে দ্বৈরথ যুদ্ধের আহ্বান পাঠানো হবে শঙ্খচূড়ের কাছে।

এই সংবাদ জ্ঞাপনের জন্য এক দূতকে পাঠানো হলো, তিনি হলেন পুষ্পদন্তক।

পরম সৌজন্যে দূতকে বরণ করে নেওয়া হলো। পুষ্পদন্তক এসে দাঁড়ালেন অসুররাজের সামনে।

বিমূঢ়.বিস্ময়ে সেই গন্ধর্বগায়ক দেখতে থাকেন অসুরের রাজ্যশাসন। আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন।

বলতে থাকেন শঙ্খচূড়—আমি ঐ রণ আহ্বান স্বীকার করলাম দূত। দেবতাদের রাজা প্রত্যার্পণের পরিবর্তে ঐ যুদ্ধেই যোগ দেবো আমি, আগামী প্রভাতেই চন্দ্রভাগা তীরবর্তী বটবৃক্ষের সামনে যোদ্ধবেশে অবতীর্ণ হবো আমি!

এই সংবাদ যথা সময়ে কি পৌঁছে ছিল তুলসীর কাছে? কেমন করে? প্রতিটি রণে সম্পূর্ণ বিজয়ী শঙ্খচূড় এখন আর কোন রণযাত্রার সংবাদ তাঁর সাধ্বী স্ত্রীকে শোনান না। তিনি জানেন, সতীত্বের অমোঘ শক্তির বলয় আছে তাঁর চারপাশে। তুলসী অবিনাশী পতিব্রত্যের সর্ব মঙ্গলময় মঙ্গল কবচ ধাবন্ন করিয়েছেন স্বামীকে। মৃত্যুও তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।

কিন্তু সেই নিশাকালে কি যেন হয়ে গেল তুলসীর? স্বপনের মধ্যেই তিনি দেখলেন, স্বামীর কণ্ঠনালী থেকে উদ্ভুত রুধির পানে শত শত শিয়াল ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

নিদ্রা ভঙ্গেও শিহরিতা হতে থাকেন তুলসী।

নিদ্রিত পুত্রের পাশে শুয়ে ছিলেন তুলসী। সদ্যজাগ্রত স্বামীর পালঙ্কে এসে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর বুকে। বললেন তিনি—হে প্রাণনাথ, বলুন, কেন এমন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখলাম?

মৃদু হাসলেন শঙ্খচূড়। প্রিয়াকে দুটি বাহুর বাঁধনে বন্দিনী করলেন।

শঙ্খচূড় বুঝতে পারলেন, হয়তো তাঁরও অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে। বিষ্ণু উপেক্ষিতা এবং গণেশ প্রত্যাখ্যাতা তুলসী তাঁর মানসিকতাকে সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ভাবিত করেছেন। কিন্তু সতী-আত্মা তুলসী যে আসন্ন বিপদের কথা শুনতে পেয়েছেন, তা উপলব্ধি করার মত সাহস আছে শঙ্খচুড়ের!

শঙ্খচূড় হাসতে থাকেন। বলেন তিনি—হে প্রিয়ে, এই দুঃস্বপ্ন এক অলীক দর্শন বলে প্রতিভাত হবে তোমার কাছে।

আমি তো বিশ্বজয়ী। আগামী কালের যুদ্ধে জয়লাভ করবো আমি।

তবুও শঙ্কা কাটেনা তুলসীর। বারে বারে তিনি বলতে থাকেন—দেবাদিদেব পিনাকপাণি বিষ্ণুপ্রদত্ত শূল লাভ করেছেন।

শঙ্খচূড় বলেন—আমি তার থেকেও শক্তিশালী আয়ূধ অর্জন করেছি। তাহল তোমার প্রতিশ্রুতি? তুমি বলেছো, দেবলোকের নিধনব্রতে সর্বকাল আমার সহায়িকা রূপে পাশে থাকবে।

তোমার এই সতীত্বেই আমার পরমায়ুর অঙ্গীকার লুকিয়ে আছে। তা এতোদিন রক্ষিত থেকেছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

এবার আর সন্ত্রাস নয়। আবেগে থরথর করে কেঁপে উঠলো স্ত্রীর তনুলতা।

তুলসী বলতে থাকেন—অসুরলোকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহেশ্বরকেও পরাজিত করুন। এই কামনা করি স্বামী।

শঙ্খচূড় হাসতে হাসতে বলেন—এখনো পর্যন্ত আমি গণেশের কাছে কোন সিদ্ধি প্রার্থনা করিনি। আগামী প্রভাতেও করবো না।

সকাল হয়েছে। শঙ্খচূড় এবার রণসাজে সজ্জিত হচ্ছেন। অভীষ্টদেবকে বন্দনা করলেন। উৎকর্ণা হয়ে তুলসী শুনলেন। বিস্ময়ে বিবশিত হয়ে গেলেন তিনি, কেননা শঙ্খচূড় ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা মহেশ্বরের প্রার্থনা করছেন না—তিনি ত্রিগুণাতীত এক অসীমতার বন্দন-বাণী উচ্চারণ করছেন।

এতোদিন তো স্বামীর এই অভীষ্ট দেবতার সন্ধান রাখেননি তুলসী। তিনি বুঝতে পারলেন না কার স্তব সঙ্গীত এখন ধ্বনিত হচ্ছে শঙ্খচূড়ের কণ্ঠে!

শঙ্খচূড় বলতে থাকেন—যার ইচ্ছায় এই সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, তাকে আমি স্মরণ করছি। যাঁর খেলাতে রবি ভ্রাম্যমাণ হয়, যাঁর আজ্ঞায় স্রোতস্বিনী ক্ষীণকায়া বা স্ফীতকায়া হয় আমি শুধু তাঁর ইচ্ছায় চালিত হবো।

শঙ্খচূড় জায়ার সমস্ত শরীর শিহরিতা হয়ে ওঠে। তিনি ভাবতে থাকেন—এ কোন দেবতা? সর্বজ্ঞ এবং সর্ব পরিব্যাপ্ত? তিনি কে?

ভাবনা তাঁর সেখানেই থেকে যায়। তিনি বলতে থাকেন—শঙ্খচূড়, আপনি যে এতো বড় সাধক, সেই পরিচয় এখনই আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

এবার বোধহয় যাবার সময় হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তুলসীর আঁখি দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল কি? রণ উন্মাদ স্বামীকে নিবারণের চেষ্টা করেছিলেন কি? এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা জানিনা। আমরা জানি শঙ্খচূড়ের সমস্ত শরীর তখন ঔদ্ধত্যে থরথর কম্পমান। তিনি অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছেন তাঁর চোখের সামনে।

কেবলই মনে হচ্ছে তাঁর, দেবলোককে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করা পর্যন্ত এই আবেগের মৃত্যু ঘটবে না।

চোখ দুটি বন্ধ করলেন শঙ্খচূড়। এবার অন্য একটি ছবি ফুটে উঠলো তাঁর বিস্মিত চোখের পাতায়।

গোলকের চিরন্তন রাসমণ্ডলে আপন বল্লভের সাথে কৌতুক ক্রীড়ায় উন্মত্তা বিরজার প্রতি রুষ্টা হয়েছিলেন মাধববল্লভা। তিনি চেয়েছিলেন, কৃষ্ণকে সর্বক্ষণ নিজের অঞ্চলে বন্দী করে রাখতে।

সৌরলোকে মহাদুর্যোগ সূচিত হয়েছিল। রাধিকা সাহসী উষ্মা প্রদর্শন করেছিলেন। এমনকি রাধিকার বিরুদ্ধাচারী হয়ে উঠেছিলেন পারিষদ সুদামা। তিনি বলেছিলেন—কৃষ্ণের প্রতি এই ক্রোধ সম্বরণ করো সখি।

রাধিকা এবার তাঁর ক্রোধ বর্ষণ করলেন সুদামার ওপর। রাধিকার আজ্ঞায় দুর্বার তেজস্বিনী সখিদলের লক্ষ্যে সুদামাকে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল।

তখনই সুদামা অভিশাপ দিয়েছিলেন—তুমি কৃষ্ণপক্ষ দুষ্ট। তুমি আমাতে দানবী দোষ আরোপ করেছো। তুমি এখনই দানব যোনি প্রাপ্ত হও।

আকুল হয়ে উঠেছিলেন গোলকেশ্বর। রাধিকা বাক্য অমোঘ কিন্তু তাঁর অভিশাপ বাণীর সূত্র ধরেই কৃষ্ণের কণ্ঠ উচ্চারিত হতে থাকে—এই গোলকে কৃষ্ণপ্রিয়া যে গোপিনীতে আসক্ত তোমার মন, তুমি সেই জন্মে ঐ গোপিনীকেই লাভ করবে।

—আবার তোমার কাছে কবে ফিরে আসবো? সুদামা প্রশ্ন করেছিলেন?

পীতবাসা বংশীধর জবাব দিয়েছিলেন—তোমার সঙ্গিনী রাধা অংশতনুর কলুষতায়।

চমকিতা হয়ে উঠেছিলেন শ্রীরাধিকা।

সুতরাং আত্মোপলব্ধি হয়ে গেল শঙ্খচূড়ের। বৈকুণ্ঠলোকে প্রত্যাবর্তনের বাসনা তীব্র হয়ে যায় তাঁর। তাঁর পৌরুষাকারে আঘাত লাগে। তিনি ভাবতেই পারছেন না, কিভাবে তুলসী রতি শীৎকারের কামনাতে আক্রান্তা হবে?

যুদ্ধ প্রত্যাগত স্বামীর সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চান তুলসী। অর্গল বন্ধ করেছেন। রাজ শয়নের অভ্যন্তর ভাগ। সেখানে এখন এক আশ্চর্য নাটকের দৃশ্য অভিনীত হতে চলেছে।

স্তিমিত আলোকের ছায়াছন্ন সন্ধ্যার মায়াময় পরিবেশ। শৃঙ্গার শোভায় সুসজ্জিতা হয়েছেন তুলসী। ধীরে ধীরে স্বামীর শরীর থেকে এক একটি করে আবরণ সরিয়ে দিচ্ছেন। পর মুহূর্তে মনে হয় তাঁর, স্বামীর চেতনে অবচেতনে কেমন এক শিহরণ জেগেছে।

চোখ দুটি বন্ধ করেন তুলসী, কে উপবেশন করে আছেন সামনে? তবে তিনি কি শঙ্খচূড় নন? তবুও তাঁকে পেতে মন কেন এতো আকুল হয়ে উঠেছে? তুলসীর মনে হলো, প্রথম শৈশবের চেতন মুহূর্ত থেকে তিনি বোধহয় এই পুরুষটিকেই তাঁর শয্যাসঙ্গী হিসাবে প্রার্থনা করেছেন। এতোদিন যে শঙ্খচূড়ের ঘরণী হয়ে সময় কাটিয়েছেন, তার অন্তরালে আছে নিরন্তর প্রতিশোধ স্পৃহা।

পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিতে বাধ্য হলেন তুলসী। তিনি পতিব্রতা। তিনি শঙ্খচূড়ের পত্নী। তিনি কি পর পুরুষের সাথে এই শরীর খেলায় অংশ নিতে পারেন?

অথচ, তখন আর কিছু করার নেই। ক্ষণে-বিক্ষণে কেমন যেন রাগ উন্মাদিনী হয়ে উঠেছেন তুলসী—শেষ পর্যন্ত কাঙ্খিত সেই মৈথুন মুহূর্তটি অতিবাহিত হয়ে গেল। সর্বশরীরে এক অপূর্ব শিহরণ জেগেছে। চেতনারা হারিয়ে গেছে। নিঃসরণ জনিত ক্লান্তির কালো মেঘে ঢেকে গেছে মনের আকাশ। তখনো মুখে এক অদ্ভুত হাসির প্রলেপ ছড়িয়ে রেখেছেন শঙ্খচূড়রূপী ঐ মহাত্মা।

কে আপনি? অচিরেই আপনার আসল পরিচয় প্রকটিত করুণ আমার কাছে।

ব্যাকুলা বিহ্বলা তুলসীর কণ্ঠে তখন ঝঙ্কৃত হচ্ছে এই আবেদন।

দুর্জ্ঞেয় হাসির মুখোস খুলে নারায়ণ বলতে থাকেন— তুলসী, তুমি আমাকে ভালো ভাবে প্রত্যক্ষ করো।

দিব্য চোখে তুলসী দেখতে পান, স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে। যৌবনের বিরহিনী দিনে তিনি তো বিষ্ণু প্রেমে মাতোয়ার হয়েছিলেন। আজ এভাবে বিষ্ণু তাঁকে প্রতারকের মত ভোগ করেছেন, লজ্জায় নতমুখ হয়ে গেলেন তুলসী।

নারায়ণ বলতে থাকেন—তুলসী এতে তোমার কোন দোষ নেই। মনে রেখো, এখানে যা কিছু ঘটছে সবই পূর্ব নির্ধারিত। তুমি এভাবে সতীত্ব না হারালে শঙ্খচূড়ের বিনাশ সম্ভব হয় না।

চমকিতা হতে হলো তুলসীকে। তাহলে? রণক্ষেত্রে কি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন শঙ্খচূড়। আর কখনো তাঁর সিঁথি সিঁদুরে রঞ্জিত হবেন না? বৈধব্যের শুভ্র বেশ তাঁকে পরিধান করতে হবে।

তুলসীর এই ব্যথাচ্ছন্নতা দেখে মনে দুঃখ পেলেন নারায়ণ। কিন্তু তিনি তো সর্ব ত্যাগী। তিনি তখন উচ্চারণ করছেন সেই মহামন্ত্র—তুলসী, তোমার জীবনের সাধনা পূর্ণ হয়েছে। স্বীকার করছি আমি এইভাবে আমার সাধিকাদের চরম কষ্ট দিই। ভেবো না, মনে মনে আমি খুব আনন্দে থাকি। প্রতি মূর্হূতে তোমাদের মত গোপিনীদের কথা মনে পড়ে যায় আমার। এক নির্মোহি মুখোসে মুখ ঢেকে রাখতে হয়। আমি আশীর্বাদ করছি তুলসী, এ জীবনের সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটে যাবে। তুমি চিরদিন আমাকে লাভ করবে। সখা রূপে, স্বামী রূপে।

দেখতে দেখতে সেই শরীর অদৃশ্য হয়ে গেল। তখনো, তুলসীর কানে লেগে আছে বজ্র নির্ঘোষ। আকাশে অগ্ন্যুৎপাত হলে, কি? বিস্ময়ে তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

সেই তুলসী, এখনো শ্রীবিষ্ণুর সাথে সংযুক্ত হয়ে আছেন। ভালোবাসার পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধা। যেখানেই আমরা শ্রীশ্রী বিষ্ণুর পূজার আয়োজন করে থাকি, সর্বাগ্রে তাই তুলসীকে স্মরণ করতে হয়।

পুণ্যব্রতা ধর্মব্রতা



মানসিক প্রশান্তি ফিরে পাবার লক্ষে মানসপিতা ব্রহ্মার নির্দেশে নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করে অবশেষে গয়াক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছেন মরীচি!

বসেছেন তিনি মহাভাগ মুনিবরের সম্মুখে। এতোদিন বাদে তাঁর হৃদয়ের চঞ্চলতা হারিয়ে গেছে। এক অদ্ভুত আনন্দসাগরে অবগাহন করছেন তিনি।

ঋষি সত্তম মরীচি। জটাজুট ধারণ করেন। ভূমিশয্যায় শয়ন করেন। অজিন পরিধান করেন। সমস্ত কুসঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে চলেন। ফলাহারে জীবন কাটান।

আত্মগরিমার কোন উপকরণ সঙ্গে রাখেন না। পান করেন মন্ত্রপূত জল। সত্যপূত বাক্য প্রয়োগ করেন। অহিংসা, অমিথ্যা, অস্তেয়, অবিলাস এবং অপরিগ্রহ—এই

পঞ্চবিধ যাম পরম নিষ্ঠাবান তিনি। পঞ্চপ্রকার নিয়মেও অসীম আস্থা আছে তাঁর। যুগে-যুগান্তরে তিনি নানা আসনে স্থিত থেকেছেন। প্রাণ, অপান উদান, ব্যন এবং সমানকে পঞ্চবায়ু স্থিতিকরণে একীভূত করেছেন।

কিন্তু কেন, কিজন্য তিনি এইভাবে নিরন্তর মেতে উঠেছেন কঠিন কঠোর সাধনায়?

মনে কি পড়ে তাঁর, সেই পূর্বজন্মের কথা? মনে পড়ে, সহস্র বৃশ্চিকের দংশন একদিন অনুভব করতে হয়েছিল তাঁকে। অস্থির স্বার্থপরতার মানসিক উন্মাদনা উৎসারিত হয়ে উঠেছিল তাঁর মনের মধ্যে?

নিজেরই অভিষ্টা পাত্রীকে অভিশাপে অন্বিতা করেছিলেন। সেজন্যেই বোধহয় তাঁকে এমনভাবে কাটাতে হচ্ছে আত্মগ্লানিকর মগ্ন প্রহর। তপস্যার মাধ্যমে সেই পুরোনো দিনগুলিতে পা রাখার চেষ্টা করলেন মুনিবর। তখন কোথায় ভেসে গিয়েছিল তাঁর বহুদর্শিতা এবং ত্যাগের গরিমা। তখন তিনি এক নারীর অনিন্দ্য রূপকান্তিতে কি আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন?

মনে পড়ে যায়, সেই প্রথম প্রভাতের কথা। মধুময় হোক রাত্রি, মধুক্ষরা হোক ঊষশী। মধুময় হোক মধ্যম লোকের প্রতিটি ধূলিকণা।

শিলা বেদীর ওপর বসে থাকা মরীচির চোখের সামনে তখন এক অপরূপা নাবী এসে দাঁড়িয়েছেন।

হাত থেকে বিস্খলিত হয়ে গেছে কমণ্ডলু। পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে গেছে জপমালা। কে এসেছে? এইভাবে?

মনে হলো ঋষির, তিনি বোধহয় কামবাণী শ্রবণ করেছেন।

মনে হলো তাঁর, এই নারী মূর্তির বিগঠিত নারীত্বে সকালের সূর্য আরো বেশী রক্তলাল হয়ে উঠেছে। কি দেখেছিলেন তিনি, ঐ প্রণয় অভিসারিণী তন্বী তরুণীর সমস্ত শরীরে?

কিন্তু, নির্মম নিষেধের শাসন ছিল। তিনি তো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তিনি কি এইভাবে এক রমণীকে প্রেম উপহার দিতে পারেন?

তিনি বলেছিলেন—নিঃশঙ্কা হও কন্যা। আমি রাক্ষস নই। পদ্মযোনির মানসপুত্র আমি। সঙ্কোচ সারল্যে সমুত্তরা হয়ে তুমি তোমার পরিচয় জানাও। বলো, কে তুমি?

মেয়েটি চোখ তুলে তাকিয়ে ছিলেন। পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর—ধর্মকন্যা আমি, ধর্মবতী। বিশ্বরূপার দুহিতা। আমার নাম ধর্মব্রতা।

হেসেছিলেন তাপস, বলেছিলেন তিনি—হায় ধর্মব্রতা, তোমাকে দেখামাত্র কেন আমার শরীরে এই শিহরণ জেগেছে? তুমি কি আমাকে স্বামীত্বে বরণ করবে?

মরীচি দেখেছিলেন তাঁর বাক্যের সমাপিকায় শিহরিত দীপের মত চমকে উঠেছিলেন ঐ কন্যা। পরক্ষণেই তিনি বিরহের সজ্জাতে মুখ ঢেকেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন—ঋষি এই অধিকার আমার নেই। আমি জেনেছি, আমার পিতার

কাছে একমাত্র ঐ দেবতাই আমার ব্রত, বরণীয়। তাঁর চরণ পদ্মে নিজেকে আত্ম নিবেদন করবো।

আরো বলেছিলেন ঐ কুমারী—সেই দেবতা কে, আমি জানি না। তবুও আমি চাতকীর মত উন্মুখ হয়ে বসে আছি। কখন ঘন বর্ষা দেখা দেবে। মেঘের বুক থেকে শুরু হবে বারিধারা।

তুমি কি এখন সেই দেবতার সন্ধান পেয়েছো? বিহ্বল মরীচি প্রশ্ন করেছিলেন।

সহসা লাজনতা হয়ে ছিলেন ঐ কন্যা। জবাব দিয়েছিলেন তিনি—হ্যাঁ, এই মুহূর্তে এখানেই আমি আমার পরম পুরুষের সন্ধান পেয়েছি।

আরো বেশী শিহরিত হয়ে উঠেছিলেন মরীচি। এ কি কথা বলছে মেয়েটি?

তখন ধর্মব্রতা, আরো বেশী অনুরাগিণী।

বেশ, মনে আছে মরীচির, সেই মুহূর্তে তিনি এক দুর্মর অভিলাষে মেতে উঠেছিলেন। অকথিত সুখের নিঃসীম উপলব্ধিতে ভরে গিয়েছিল তাঁর অন্তর।

তারপরেরটুকুও কি মনে আছে তাঁর? কি ভাবে ঐ কন্যাকে তিনি অধিকার করেছিলেন? তাঁর অনুপম দেহবল্লরী?

শুরু হয়েছিল এক অপূর্ব মিলন। লাবণ্যময় মুর্হূত কেটে গিয়েছিল।

মরীচি ভাবতেও পারেন নি, রমণী অঙ্গের পরতে পরতে এতো আনন্দ উপচার আছে। তিনি তখন উন্মাদ হয়ে গেছেন।

তাহলে? কোথা থেকে এসেছিল সেই শ্রান্তি? যার উৎস আজও তিনি খুঁজে পান না। ধীরে ধীরে সেই ক্লান্তি এসে গ্রাস করেছিল সবকিছু।

কখন যে আসতো তিমিরা রজনী, জানতে পারতেন না ঋযি। কখন দিক বধূর সলজ্জ মুখশ্রীতে উদ্ভাস হয়ে উঠতো পূর্ব দিগন্তরেখা, সেকথাও তখন চিন্তা করতে পারছেন না ঋষি।

তিনি শুধু ভাবছেন, এই যে সর্বক্ষণ একটি তরুণীর প্রতি আসক্ত থাকা, একেই কি কাম বলে নাকি?

আত্ম উন্মাদনের সমীক্ষা করতে চাইলেন তিনি। কি ভাবে এই কামকে অতিক্রম করা যেতে পারে? তিনি তো শুধুমাত্র এক যুবতীর সাথে অনন্ত রমণে মগ্ন হবেন না, তাঁকে অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে। এই যে জন্ম, এর উৎস কোথায়? মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? এ সব প্রশ্নের উত্তর না পেলে পরম পিতার কাছে কি জবাব দেবেন তিনি?

তাই বোধহয় তাঁকে বিরহীর ছদ্মবেশ ধরতে হয়েছিল। উদাসীনতার মুখোস পরতে হয়েছিল। আজ বহুদিন বাদে সেই মুর্হূতগুলির কথা স্মরণ করে হয়তো শোকস্তব্ধ হয়ে যান ঋষি। ভাবতে থাকেন, এভাবে এক রমণীকে মধ্যরাতে নিদ্রাহারা করা উচিত হয়নি তাঁর। তিনি কি অবিবেচক? তিনি কি হৃদয়হীন?

কিন্তু, মরীচির এই দুর্ব্যবহারে তখন কি কুপিতা হয়ে উঠেছেন সাধিকা ধর্মব্রতা?

মরীচি ভেবেছিলেন ধর্মব্রতা বুঝি তাঁকে বাক্যবাণে জর্জরিত করবেন। তার পরিবর্তে এ-কি কথা শুনতে পাচ্ছেন তিনি?

ধর্মব্রতা ধীরে ধীরে বলতে থাকেন—হে মহাত্মা, পতিরূপে আপনাকে লাভ করে আমি যে সর্বস্ব সমপর্ণ করেছি, তাহলো আমার চিরআরাধ্য দেবতার সকাশে নিঃশেষ আত্মোৎসৃজন। ভেবে দেখুন ব্রহ্মানন্দন, মরীচির কাছে নয়, প্রতি মুর্হূতে আমি তাঁকেই নিবেদন করেছি আমার এই বরতনু। যখন আপনি আবেগের আশ্লেষে চোখ দুটি বন্ধ করেছেন, কেবলই আমার মনে হয়েছে, তিনি বুঝি মনুষ্যরূপ পরিগ্রহ করে আমার চোখের সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।

শুনতে শুনতে অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান মরীচি। নিজের পৌরুষকে ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয় তাঁর। এইভাবে তিনি কৃষ্ণের ছদ্মবেশ ধারণ করে বিমোহিত করেছেন এক অবলা নারীকে? একি সত্যি? নাকি কোন অভিশাপের ফলশ্রুতি?

কিছু বলার মত ভাষা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল স্তবন রহিত ঋষির। করণীয়ের কোন সন্ধান তিনি খুঁজে পাননি। কেবলই তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি বুঝি তাঁর মানস পিতার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন। শঙ্কা কেঁপেছিল শরীরের সর্বাঙ্গে। সর্বাত্মক মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন তিনি।

আজও চোখ বন্ধ করলে বিবেক মুকুরে সদাজাগ্রত একটি অভিশাপের ছায়া প্রত্যক্ষ করেন ঋষি। যেমনভাবে ঊষাকাশে অস্তমিত হয়ে যায় শুকতারা, তেমনভাবেই সেই দেহাসীনির তনুলতা তখন আরো দূরে চলে যাচ্ছে। রিপুর তাড়নাতে তখনও অস্থির হয়ে কেঁপেছিলেন ঋষিবর।

অনেকক্ষণ বাদে তিনি দেখেছিলেন, অস্তশিখরে রক্তবরণ হয়ে উঠেছে আকাশ। দিন তীর্থ দিবাকর বুঝি পরিক্রমার অন্তে এবার কাঙ্খিত তিমির শয্যালোকে শয়ন করবেন।

সেই সায়ন্তন সন্ধ্যার ম্লান বিজনতায় দাঁড়িয়ে আত্মোপলব্ধিতে ভরে গিয়েছিল মরীচির মন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই পৃথিবীর সকল পুরুষের সৃজন এবং স্পন্দনে, সোহাগ এবং মৈথুনে তিনি বিরাজমান। তিনি অনতিক্রমণীয়। তিনি দুর্লঙ্ঘ্য। তিনি সদা সর্বদা হাস্যমুখে আমাদের অবলোকন করেন। আমাদের সকল রতি তাঁকে কেন্দ্র করে। তাঁকে উদ্দেশ্য করে নিবেদিত আমাদের সোহাগ এবং শিহরণ।

এইভাবে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন ঋষি। শান্ত হয়েছিলেন তিনি। আবার মগ্ন থেকেছিলেন ঐশী সাধনাতে।

আজ সকল কথাই মনে পড়ে গেল তাঁর। আরো মনে পড়ে গেল অনেক কিছু। তিনি কি সাক্ষাত পেয়েছিলেন পতিব্রতা ঐ রমণীর? নাকি এই কটি কথা উচ্চারণ করার পর অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে গিয়েছিলেন ধর্মব্রতা—তার সাথে আর কখনো দেখা হয়নি ঋষির?

তবুও তাঁকে তো তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন—মানসিক প্রশান্তির মুর্হূতে। জম্বু দ্বীপের উচ্চতায়। পুষ্কর তীর্থের সুশোভিত অরণ্যে!

তখন, আগেকার সেই উচ্ছ্বাস হারিয়ে গেছে কি? বিস্ময় কি জেগেছে তাঁর দুটি চোখের তারায়? আর তো আসঙ্গ অভিলাষে সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে না?

কেন এমন হয়? কেন সর্বদা সৃষ্টি স্থিতি এবং সংহারের ঐ ঈশ্বরের কথা মনে পড়ে। মনে হয়, কি লাভ এইভাবে এক তরুণীর আকর্ষণে শরীর দান করে? তিনি তো কখনো আমাকে মরীচি হিসাবে বরণ করতে পারবেন না। সদা সর্বদা তাঁর মনের মধ্যে এই প্রত্যয় জাগ্রত থাকবে, তিনি ভগবান নারায়ণের উপাসনা করছেন।

এভাবেই কেটে গেছে একটির পর একটি প্রহর। যৌবনে লেগেছে বেলা শেষের ছটা।

অবশেষে গয়াতীর্থে এসে দেখা পেয়েছেন তাঁর পিতার সাথে। সংশয় উন্নীত কণ্ঠস্বরে মরীচি ছুঁড়ে দিয়েছেন কটি উদ্বেগ আকুল প্রশ্ন। প্রশ্ন জানতে চেয়েছেন প্রবীণ মরীচি—হে পিতা, আমি কি ঐ দেবশীলার সাথে আমার নৈকট্য অনুভব করতে পারবো না?

কালবক্তা ঋষির শুভ্রায়িত বদনমণ্ডল তখন এক অমলিন হাস্য রেখায় উন্নীত হয়ে উঠলো। অপার্থিব বিস্ময়ে উল্লাসিত হয়ে উঠলো তাঁর চোখদুটি। তিনি ধীরে ধীরে বলতে থাকলেন—মরীচি, দুঃখ করো না। একটি কথা স্মরণে রেখো, তুমি হলে সেই অনাদি অনন্ত নারায়ণের অংশমাত্র। নিজেকে তাঁর সাথে একীভূত করে দাও। এক অপূর্ব নৈকট্য জনিত আনন্দে পরিপ্লাবিত হবে তোমার মন।

মরীচি পিতার কথামত চোখ বন্ধ করলেন। পরিশুদ্ধ হয়ে উঠলো তাঁর অন্তর। তিনি বুঝতে পারলেন, এবার আত্মোপলব্ধি ঘটে গেছে।

একদা যাঁর উল্লাসের উচ্ছ্বাসস্রোত রূপে প্রবাহিত হতো তাঁর ধমনীতে, যার বিধুরতার ভাব অশ্রুধারার সাথে তিনি গ্রহণ করেছেন—অথচ, যাঁকে তিনি প্রতিস্পর্ধী ভেবেছেন, সেই মহামূর্তিমান নারায়ণ এসে এখন তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, আর কোন ভয় নেই মরীচির। সমস্ত উদ্বিগ্নতা থেকে তিনি মুক্ত হলেন। তিনি অনন্ত জীবনের অভিসারী হলেন।

তখন কোথায় ছিলেন ঐ তাপসী কন্যাটি? তিনিও কি তখন চোখ বন্ধ করে নারায়ণকে স্মরণ করছিলেন? তিনি যে ধর্মব্রতা, সাধিকা, এভাবে জন্ম জন্মান্তরে নারায়ণের সহকারিণী হিসাবে বেঁচে থাকবেন। শয়নে এবং স্বপনে সর্বদা তিনি ধ্যান করবেন ঐ মহাত্মার রূপকল্পতাকে।

স্বপ্ন সহচরী ললিতা এবং বিশাখা



না, কোন পুরাণের পাতায় পাতায় তাদের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়নি। তারা কেউ বৈষ্ণবী পঞ্চকা নয়। তারা নয় তাপসিকা বেদবতী অথবা বিষ্ণুবল্লভা তুলসী। কিন্তু আমাদের লোকায়ত সাহিত্যে আর আমাদের উৎসারিত গানে তারা বেঁচে আছে। যেমনটি ছিল তারা, কলহাস্য প্রিয়া, প্রগলভা—। তরুণীরা যেমনটি হয়ে থাকে। আরক্তিম বদন, কৌতুক ভাষ্য সুভাতিনী, শুচিস্মিতা ও অনন্ত যৌবনের অধিকারিণী। তারা কে?

তারা হলো শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় দুই সখী—ললিতা এবং বিশাখা।

কবে কোথায় কার ঔরসে জন্ম হয়েছিল তাদের, কোন মাতার স্নেহধারা বর্ষিত হয়েছিল অবিরাম—সে সব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়ার কোন উপায় নেই। অতএব, হে মন আমরা এখন যদি সেকথা ভুলে যাই, আমরা যদি মনে করি সূর্যের ঔরসে এই পৃথিবীর বুকে জন্ম হয়েছিল তাদের, তারা অনন্ত যৌবন পেয়েছিল মধুঃক্ষরা বাতাসের কাছ থেকে, বসন্ত সমীরণ এসে তাদের মনকে রঙীন নেশায় মাতিয়ে ছিল—তাহলে কি কোন ক্ষতি হবে?

তারা তো কেউ বেদজ্ঞা নয়। ঐশী শক্তির অধিকারী নয়। আধ্যাত্মিক চিন্তার জগতে তাদের পদধ্বনি শোনা যায়নি। তারা হলো এক সাধারণা তরুণী। যেমনটি হয়ে থাকে পাশের বাড়ীর মেয়েটি। সকাল সন্ধ্যায় তার সাথে দেখা হয়। কখনো তার চোখে কাঁপে বিরহের অভিমান। কখনো তার স্ফুরিত নাসারন্ধ্রে সে কোনরকমে চেপে রাখে চপল মনের উচ্ছ্বাস।

হায় ললিতা, হায় বিশাখা, এভাবে যদি তোমরা বিষ্ণুর প্রিয়সঙ্গিনী না হতে, তাহলে কোথায় আজ মুখ লুকোতে বলো? বিস্মরণে অন্ধকারে? বিস্মৃতির অতল তলে রচিত হতো তোমাদের ধূলি ধূসরিত শয্যা।

তোমরা ভাগ্যবতী। এভাবেই অধিকার করতে পেরেছো পরম শ্রেষ্ঠ নারায়ণকে। হতে পেরেছো তাঁর প্রাণের দূতী। তাঁর অনেক অকথিত কথা বহন করেছো।

ইতিহাস তোমাদের কি ভাবে মনে রাখবে, আমরা জানি না, কিন্তু আমরা যারা প্রেমকে এখনো সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে থাকি, যারা প্রেমিকার তপোভঙ্গ করবো বলে থাকি আত্মনিবেদিত, তাদের কাছে তোমরা চিরন্তন বিস্ময়। এক শেষ না হওয়া গল্প। মাঝরাতের রূপকথা।

এসো, অয়ি বরবর্ণিনী, তোমাদের রূপ মাধুর্যের মোটামুটি একটা ছবি এঁকে ফেলা যাক। অবশ্য যতটুকু আঁকা আছে বৈষ্ণব সাহিত্য এবং লোকগাথায় কিংবা কোন পট্ট বস্ত্রে যেমন উদ্ভাসিত হয়েছো তোমরা।

হায়! রূপের অভিসারে কে কাকে হারিয়ে দেবে বলতো? একজনকে অন্যজনের সার্থক প্রতিচ্ছবি বলা যেতে পারে কি?

চিরসখ্যতা স্থাপিত হয়েছিল তোমাদের মধ্যে। তাই সর্বদা তোমাদের নামদুটি একত্রে উচ্চারিত হয়েছে।

তাদের সাথে তিনি কখন অন্যমনে মেতে উঠতেন এক আশ্চর্য খুনসুটি খেলাতে। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁর গোপিনীদের শরীর সৌষ্ঠবের নিলাজ বর্ণনা আছে। পড়তে পড়তে আমাদের গণ্ডদেশ রক্তিম বর্ণ ধারন করে।

কেউবা ছিল কলহাস্য প্রিয়া, কেউবা যৌবন মদমত্ত বিলাসিনী। কেউ আবার অকারণে চোখের কোণে কামনার নীল অঞ্জন আঁকতো। কেউ ইচ্ছে করেই কাঁচুলিটা একটুখানি উন্মুক্ত করে রাখতো। কোমল গোলাপী স্তনবৃন্তের আভা কৃষ্ণকে প্রদর্শন করাবে বলে।

অথচ তাদের নামতো আমরা দেখতে পাইনা। এখানে এই দুই রঙ্গরসিকা প্রিয়ার উপস্থিতি।—ললিতা এবং বিশাখা।

কেন তারা এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের হৃৎসাম্রাজ্যে অধীশ্বরী হতে পেরেছিল। অতিরিক্ত কি ছিল তাদের?

সেই একই নারীদেহের সমাহার। নিতম্ববতী, ক্ষীণকটি, দুটি পরিপুষ্ট স্তন। চোখ থেকে ঠিকরে আসা কামনার আগুন। উন্নত নাসিকা। সমুন্নত কপোল। আলুলায়িত কেশ দাম, যা থাকে সমস্ত যুবতী মেয়ের।

তবুও অতিরিক্ত কিছু ছিল ললিতা এবং বিশাখার। ক্ষণে-বিক্ষণে তারা পাল্টে যেতে পারতো বহুরূপীর মত?

কখন প্রথম দেখা হয়েছিল? বৃন্দাবনের কোন কুঞ্জছায়ায়? তখন কি ছিল বসন্ত মাস? কুহু স্বরে কি ডেকে উঠেছিল কোকিল? তখন কি মধুঋতু বয়ে গিয়েছিল? সমস্ত শরীরে জেগেছিল এক আশ্চর্য শিহরণ? তখন নব কন্দর্পকান্তি এই শ্যামকে দেখে স্পন্দিত হয়েছিল দুই সখির হৃদয়? একটি শয্যাতে শুয়েছে তারা। একই অন্ন ভাগ করে খেয়েছে। সেজে উঠেছে একই আনন্দের উতরোলে।

বিশাখা আরো বলেছিল—ললিতে, চেয়ে দেখ, এমন যুবাপুরুষ, প্রথম স্পর্শ করার অধিকার আমারই থাকবে।

প্রিয় সখীর মুখ থেকে এই কথা শুনে স্বভাবতই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ললিতার। সে যে প্রথম প্রত্যক্ষ করেছে ঐ যৌবনদৃপ্ত যুবা পুরুষকে অতএব, অঙ্কের নিয়মনীতি অনুসারে তাঁকে ভোগ করার অধিকার সেই তো করতে পারে।

দুই সখীতে ঝগড়া কলহ। অবশেষে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের মধ্যে। বলেছেন— কি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তোমরা এভাবে বৈরীতার প্রাচীর তুলে দিচ্ছো? তোমরা কি জানো না আমি হলাম বহুবল্লভা। আমার যখন ইচ্ছে হবে আমি বিশাখার সাথে মেতে উঠবো কাম খেলাতে। আবার ললিতা এসে যোগ দেবে। কখনো কখনো এমনটিও হতে পারে, তোমরা দুজনে মিলে আমাকে তুষ্ট করবে। এই আমি জগত সংসারের পরিপালক শ্রীকৃষ্ণ, আমার বাসনার কি কোন অন্ত আছে?

এইভাবেই দুই সখীকে শান্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি জানেন, এভাবেই তাঁকে ষোলো হাজার যুবতী গোপিনীকে নিয়ে চলতে হয়। প্রত্যেকের হৃদয়ে কামের

আগুন জ্বলে ওঠে। মনের আকাশে বাসনার পাখী উড়ে যায়। তাদের সকলকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে প্রজাপতি পালক মহাত্মা হিসাবে কিভাবে চিহ্নিত হবেন তিনি?

অতএব শুরু হয় তাঁর অন্তহীন খেলা। কখনো দেখা যায়, অলস মধ্যাহ্নে ললিতার সাথে তিনি মেতে উঠেছেন এক শেষ না হওয়া খুনসুটির আসরে।

সহসা এই দৃশ্য চোখে পড়ে যায় শ্রীরাধিকার। স্বভাবতই কুপিতা হয় সে। হায় কি করছে কৃষ্ণ। এতো আমারই এক সহচরী। আমার চোখের অগোচরে তার সাথে মেতে উঠেছে শরীর খেলাতে।

আবার কখনো বিশাখা এসে সেই স্থান অধিকার করে। সেও ভারী মর্মবিদায়ক দৃশ্য। অন্তত রাধিকার কাছে। রাধিকা বুঝতে পারে না, এখন কার কাছে গিয়ে সে তার মনোবেদনা জ্ঞাপন করবে। একবার ভাবে, ছুটে যাবে জগত পিতার কাছে।

পরক্ষণেই মনে হয় তার, শ্রীকৃষ্ণের কাছেই এই অন্তরের বেদনা নিবেদন করলে কেমন হয়?

তখন শ্রীকৃষ্ণ সবেমাত্র শেষ করেছেন তাঁর এই খেলা। একে একে অনেক গোপিনীকে শারিরীকভাবে তৃপ্তা করেছেন তিনি। তখন তিনি তাঁর নিজস্ব দোলায় বসে আছেন। মৃদু মন্দ সমীরণে সেখানে এক তরঙ্গ উঠেছে।

বিষণ্ণা শ্রীরাধিকাকে দেখে কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছেন, কোন একটি ঘটনা তাকে এমনভাবে আক্রান্ত করেছে।

তিনি শুধিয়েছেন শান্ত স্বরে—শ্রীরাধিকে, কি হয়েছে তোমার? কেন তোমার আনত আনন এমন পাণ্ডুর হয়ে উঠছে? কোথায় তুমি হারিয়ে ফেলেছো যৌবনের রক্তরঙ? মধ্য আকাশ থেকে কেন অন্তর্হিত হয়ে গেছে দৃপ্ত-সূর্য? বলো শ্রীরাধিকা, মনোভাব গোপন করোনা আমার কাছে।

কথা বলতে গিয়ে ক্রন্দনশীলা হয়ে উঠেছেন রাধিকা। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সহচরী। তাঁকে হৃদয় এবং মন দিয়ে অধিকার করতে চান। অন্য কোন নারী সেখানে এভাবে শরীর সম্ভোগে মেতে উঠবে, আর তিনি চেয়ে চেয়ে দেখবেন তা কখনো হতে পারে নাকি?

শ্রীরাধিকার মুখে সবিশেষ শুনে হো হো করে হেসে উঠেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন— শ্রীরাধা, তুমি তো আমার আপন পরিচয় জানো। এই ভাবে আমাকে সমস্ত রমণীর সাথে মেতে উঠতে হয় অন্তহীন শরীর খেলায়। তাদের সকলের কামাগ্নি নির্বাপিত করতে হয়। তা না হলে আমি কি করে প্রেমের রাজা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করবো?

অতএব নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই কুঞ্জ কানন থেকে একাকী নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেছেন শ্রীরাধিকা। সেই চরম সত্যটা শেষ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, শ্রীকৃষ্ণ এভাবেই বহু জনের বিনোদ সম্রাট হিসাবে বিরাজ করবেন। শুধুমাত্র ললিতা অথবা বিশাখা নয়,

তাঁর কাননে একটি দুটি করে অসংখ্য কুসুমকলি ফুটে উঠবে। তাদের সৌরভে আমোদিত হবে বাতাস। তাদের মদমত্তে মাতাল হবে মন। তারই মাঝে হবে শ্রীরাধিকার উপস্থিতি।

এই সংবাদ পৌছে গেছে ললিতা-বিশাখার কানে। স্বভাবতই আরো বেশী চঞ্চলা হয়ে উঠেছে তারা। তারা তাকিয়ে আছে, কখন আসবে সেই শুভক্ষণ, সৌন্দর্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একে অন্যকে পরাজিত করার অভিলাষে মত্ত হবার।

শেষ সন্ধ্যাতে আবার ডাক পড়েছিল, শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জ কাননে। বনবালিকার ছদ্মবেশে সেজে উঠেছে ললিতা, বিশাখা। তারা সর্ব অঙ্গে জড়িয়েছে পুষ্পের মালা। শরীরের প্রকটিত অংশগুলিকে আরো বেশী যৌবন দীপ্ত করে তুলতে বাধ্য হয়েছে তারা। ইদানিং অন্যান্য গোপিনীরা যে ভাবে নিলাজ অভিসারে মত্ত হয়ে উঠেছে, সেখানে এমনভাবে আরো বেশী রূপযুবতী না হলে উপায় কি?

কৃষ্ণ সস্নেহে ডাক দিয়েছেন, কি এক মধুময় আকর্ষণ আছে—এই ডাকে। উতল বাতাস বুঝি। মনে হয় সবকিছু ছেড়ে দ্রুত চলে আসি। কখন ঐ প্রশস্ত বক্ষে আশ্রয় মিলতে পারে? কখন ঐ আঁখি থেকে পান করতে পারি বাসনার অনন্ত সুরা? তারপর অনাস্বাদিত মৈথুন আনন্দে মেতে উঠতে পারি?

কৃষ্ণ চোখ বন্ধ করেছেন। এমনটি করে থাকেন তিনি মাঝে মধ্যে। ললিতা এবং বিশাখা জানে, এখুনি প্রেমের সম্রাট শুরু করবেন তাঁর অদ্ভুত খেলা। শিহরিতা হবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। রক্তের কল্লোলে জাগবে প্লাবন। মাথার কোষে কোষান্তরে অদ্ভুত একটা সুরের মূর্চ্ছনা শুনতে পাবে তারা।

রাত ঘনিয়ে আসে, তখনো হুঁশ ফেরেনি শ্রীকৃষ্ণের। এবং দুই সহচরী, তখন তাঁর হৃদয়ের তন্ত্রীতে বাজিয়ে চলেছে এক মধুময় যুগলবন্দী সঙ্গীত।

সঙ্গীত সাধিকা মীরা বাঈ



অন্ধকার রাত। আকাশের বুকে শুরু হয়ে গেছে মেঘের গর্জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমুল বৃষ্টিপাত দেখা দেবে। থেকে থেকে বিজলীর চমক, সেই আলোক প্রভায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে পথ।

এমন দুর্যোগভরা রাতে কেউ কি গৃহত্যাগ করতে পারে? এখন তো নিশ্চিন্ত শয়নে সুসজ্জিত থাকার কথা!

কিন্তু যিনি চলেছেন, তাঁর গৈরিক বসন, তাঁর শোকোন্মাদ চেহারা, তাঁর আঁখিপটে শত-শতাব্দীর অন্ধকার, তিনি যে বিরহিনী মীরা বাঈ!

যা কিছু পড়ে রইলো তা থাক বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। আমি যে কৃষ্ণনাম শুনেছি।

শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ডাক দিয়েছেন। সেই নীলোৎপল শ্যাম, শিখিধারী। তাঁর মধুর বাঁশীর তানে আমাকে বিহ্বলা করেছেন।

এ আমার কি হলো? আমি এক মুহূর্তের জন্যেও স্থির চিত্ত হতে পারছিনা। কোথায় হারিয়ে গেছে আমার মানসিক দৃঢ়তা। কোন কাজে আর মন লাগেনা। সকাল থেকে সন্ধ্যা শুধু শ্রীকৃষ্ণের সাধন-ভজন করতে ইচ্ছা হয়।

সত্যিই তেমনটি হয়েছিল রাজমহিষী মীরা বাঈয়ের। তাঁর বিয়োগ বিধুর প্রণয় কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে আমাদের কাব্যে এবং সাহিত্যে। কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করে তিনি গৃহত্যাগিনী হয়েছিলেন, সমাজের অনুশাসনকে উপেক্ষা করার মত দুঃসাহস অর্জন করেছিলেন, কোন কলঙ্ক তাঁকে বিন্দুমাত্র ছুঁতে পারেনি—সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। চোখের জলে লেখা, আবেগের অনুরণনে স্পন্দিত।

কে ছিলেন এই মীরা বাঈ? ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যাবে, তিনি ছিলেন এক রাজপুত রমণী. শৌর্যে বীর্যে, অলঙ্কার এবং অহঙ্কারের পরাকাষ্ঠায় যে রাজপুতেরা চিরদিন ভারত ইতিহাসে গৌরবজনক আসনে আসীন—সেই বংশের বালা। সুতরাং শিশু বয়েস থেকেই তিনি অনন্ত গুণের অধিকারিণী হলেন। তাঁকে যত্নে অনেকগুলো কলা শিক্ষা করতে হলো, ভবিষ্যতে এক রাজপুরুষের উপযুক্ত সহধর্মিণী হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে।

পিতা মাতার তত্ত্বাবধানে সবকিছুই সম্পন্ন করেছিলেন মীরা বাঈ। অথচ, ছোটবেলা থেকেই তাঁর চরিত্রে এক অদ্ভুত উদাসীনতা। সমবয়সী সহেলীরা যখন প্রগলভা এবং কলহাস্য মুখরিতা, তখন মীরা বাঈ একাকী নির্জনে বসে বসে কার স্তব করেন? কোন কথা বললে উত্তর দেন না। উত্তর যখন দেন. মনে হয় তিনি বুঝি অন্ধকার ঘুমের পথ পার হয়ে এসেছেন। কেমন একটা বিষণ্ণতার ছোঁয়া লেগে থাকে তাঁর কণ্ঠস্বরে।

অতএব প্রমাদ গুনলেন অভিভাবকরা। এই কিশোরী কন্যার কি হয়েছে? অনেকে ছুটলেন রাজবৈদ্যের কাছে। কেউ বা গেলেন ওঝা ডাকতে। সকলে এসে পরীক্ষা করলেন কিশোরী মীরা বাঈকে। বিধান দেওয়া হলো, অবিলম্বে এই কন্যাটিকে পাত্রস্থ করতে হবে। উপযুক্ত পুরুষ সংসর্গে তাঁর মনের এই বিষণ্ণ বিদুর ভাব অন্তর্হিত হয়ে যাবে। যৌবন রঙ্গরসে পটিয়সী হয়ে উঠবেন তিনি।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। অনতিবিলম্বে ধুমধাম সহকারে মীরা বাঈকে পাত্রস্থ করা হলো। রাজস্থানের এক রাজপরিবারের গৃহবধূ হলেন তিনি। কিন্তু, সেই বিষণ্ণভাব কাটলো কই? মধুচন্দ্রিমার অবসানে যখন আবার মীরা বাঈ ফিরে আসছেন দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতায়, অনেকে ভেবেছিলেন, তিনি বোধহয় এক গৃহলক্ষী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, আরো বেশী উদাসীনা হয়ে উঠেছেন মীরা বাঈ। আগে মাঝে মধ্যে তাঁর এই ভাবসম্মীলন ঘটে যেতো। এখন দিবসে এবং

রাত্রে অধিকাংশ সময়ে তিনি বৈরাগ্য বাসিনী হয়ে অবস্থান করেন। সহসা কারো সাথে কথা বলেন না।

ইদানিং আরো একটি নতুন উপসর্গ হয়েছে তাঁর। ছোটবেলা থেকেই মীরা বাঈয়ের গলাটি ভারী সুন্দর। যখন গান করেন, মনে হয় বুঝি সাতটি পাখী উড়ে যাচ্ছে। মনে হয় কোন রূদ্ধা নির্ঝরিণীর স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে গেছে। আপন যৌবন উল্লাসে সে দু কুল ছাপিয়ে এগিয়ে চলেছে মোহানার সন্ধানে।

এখন সারাদিন গানের জগতে বসে থাকেন মীরা বাঈ। একটির পর একটি শায়ের রচনা করেন। নিজেই সেখানে সুর সংযোজনা করেন। যেমন কথার পারিপাট্য, তেমনই সুরের মুর্ছনা—দুয়ের মিশেলে এক অনবদ্য সৃষ্টির জন্ম দিয়েছে।

অতিথি অভ্যাগতেরা অবাক হয়ে গেলেন। রাজপুত রাজপরিবারের গৃহবধূ কি এইভাবে সঙ্গীত চর্চা করতে পারেন। সকলের সামনে পরপুরুষের লোভী দৃষ্টি তাঁকে বারবার লেহিত করবে?

আবার কি একটি বিধান দেওয়া যেতে পারে—মীরা বাঈয়ের কণ্ঠ নিঃসৃত এই সঙ্গীত সুরলহরীর গতি রুদ্ধ করতে হবে কি?

অদ্ভুত এক ভাবোন্মাদ অবস্থার মধ্যে দিন কাটছে মীরা বাঈয়ের। কোন কিছুই আর ভালো লাগছে না। ক্ষণে-বিক্ষণে মনে হচ্ছে তাঁর—কৃষ্ণের সাথে ঐ পরম কাঙ্খিত মিলন কবে হবে? তিনি জানেন বিভিন্ন রমণী বিভিন্ন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সাথে সাযুজ্য সংস্থাপন করেছেন। কেউ হয়েছেন তাঁর প্রেমিকা। কেউ শরীরের বিনিময়ে লাভ করেছেন অনন্ত শান্তি। কেউবা সযত্নে অধিকার করেছেন পুরুষোত্তমের হৃদয়। কেউবা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছেন কন্যা হিসেবে। কেউ হয়েছেন জননী। এবং শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বপ্রেমিক, নানাভাবে, নানা উপাচারে তিনি এইসব রমণীদের আরতি বন্দনা করেছেন। তাঁর বাসনার বাতায়ন সর্বদা খোলা থাকে। কোন মেয়েকেই তিনি বিমুখ করেননা।

মীরা বাঈ ভাবতে থাকেন, কি আছে আমার? অসাধারণ সুরলহরী ছাড়া! এই কণ্ঠমাধুর্য হতে নির্গত সঙ্গীতের স্রোতস্বিনী যদি আমি তাঁকে উপহার দিই—তিনি কি চিরকাল বিমুখ হয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন? নাকি অবিলম্বে তাঁর এই ধ্যান ভঙ্গ হবে? তিনি আমার সাথে মিলিত হবেন, তিনি যে আমার প্রাণের রাজা। আমার মনের সম্রাট। আমার চেতনার অধীশ্বর। তিনি ছাড়া এই পৃথিবীতে আর সবকিছু আমার কাছে শূন্য বলে মনে হয়।

শুরু হলো মীরা বাঈয়ের কৃষ্ণসাধনা। ঘর ছাড়লেন তিনি, সংসার ছাড়লেন, ঐশ্বর্য এবং অহঙ্কার—সবকিছু তখন পথের ধুলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে। মীরা বাঈ সর্বত্যাগিনী হয়েছেন, কোন পিছুটান নেই। পথ পড়ে আছে সামনের দিকে। সেই পথের দুপাশে কতই না কণ্টকাকীর্ণ গাছের উপস্থিতি। রাতের অন্ধকারে শ্বাপদ সঙ্কুল জন্তু-জানোয়ারেরা

নির্গত হয়। তবুও বিন্দুমাত্র সঙ্কিতা হননি মীরাবাঈ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সহায়। তিনি কি সামান্য পার্থিব ভয়ের জন্যে ভীতা সন্ত্রস্তা হতে পারেন?

রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে, শহরের বিলাস এবং বৈভবকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখে অবশেষে মীরা বাঈ হাজির হলেন এক অরণ্যপ্রান্তে। এখানে নৈঃশব্দ্যের চাদর আছে। এখানে নীরবতার আবরণ আছে। এখানে সহসা স্তব্ধতা ভঙ্গ হয় না কোন শিশুর আর্ত চীৎকারে। এখানে কোন যুবক-যুবতীর মধুর প্রেমালাপ বিন্দুমাত্র বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। কোন দ্রুতগামী শকটের শব্দ এসেও ক্ষণকাল কোলাহলের জগত নির্মাণ করে না। এখানে সবকিছু এক শান্ত সমাহিত অবস্থার মধ্যে অবস্থিত।

ভারি খুশী হলেন মীরা বাঈ। এতোদিনে মনের মত একটি স্থানে এসে ডেরা বাঁধবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর। শান্তমনে তিনি একটির পর একটি গান লিখতে থাকেন। সেই গানের মাধ্যমে আত্ম বিনোদনের সুর ফুটে উঠেছে। পড়লে চোখের পাতা ভারী হয়ে যায়। অক্ষিপল্লবে অশ্রুর সংযোজন ঘটে যায়।

কি লিখেছিলেন মীরা বাঈ—যা শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাণের দেবতা, শ্রীকৃষ্ণকেও পর্যন্ত টলিয়ে দিয়েছিল?

মীরা বাঈ লিখেছিলেন,

তুম সন কাহে প্রীত লগাই
প্রীত লগাকে সবহি ছড়াই
অব মোঁ ক্যোঁ তরসাই।
রহু উদাসী মথুরাবাসী।
তৌ ভিন দরশন পাই
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
কৈসী লাজন আই।

অর্থাৎ তোমার জন্যে আমি সর্বস্ব ত্যাগ করেছি! তোমার প্রেম, প্রীতি এবং ভালোবাসার জন্যে আমি সেজেছি পথের কাঙালিনী। আমি এক উদাসিনী মথুরাবাসী, কবে তোমার দেখা পাবো? হে প্রভু, তুমি গিরিধারী নাগর, তোমাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে এই নশ্বর জীবন রেখে আর কি লাভ?

আকাশ-বাতাস বিধৃত করে তখন মীরা বাঈয়ের কণ্ঠ উৎসারিত এই অপূর্ব স্তবমালা স্পন্দিত হচ্ছে। চলতে চলতে থেমে গেছেন ব্যস্ত পথিক। ঋষি কুমারদের চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠছে। বিরহিনী কন্যারা, যারা সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি যৌবন বনের বাঘিনী সেজে ঘুরে বেড়ায়, তারাও ক্ষণস্তব্ধ হয়ে গেছে।

ঐ শোনা যাচ্ছে মীরা বাঈয়ের ভজন। একটির পর একটি। অসংখ্য গানের মাধ্যমে এভাবেই তিনি তাঁর অন্তরের দেবতার আরতি বন্দনা করছেন।

শুনতে পাওয়া গেল, গোধূলির রক্তরাগে তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত অদ্ভুত ভজন।

আঁখিয়া কৃষ্ণ মিলন কী প্যাসী
আজ তো জায় ঘারিকা ছায়ে
লোক করত মেরী হাঁসী
আম কি ভার কোয়েলিয়া বোলে
বোলত সন্ত উদাসী
মেরে তো মন এইসী আবে
কখত লে হো কাসী
মীরাকে প্রভু গিরধরলাল
চরণ কমল কী উদাসী।।

আমার আঁখি আপনাকে দেখার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। কত লোকে আমাকে কত কথা বলছে। আমি কিন্তু সেইসব কথা গায়ে মাখছিনা। আমি উদাসিনী, একাকিনী পথ চলছি। হে প্রভু, হে গিরিধারীলাল, আমাকে কবে আপনি আপনার চরণে স্থান দেবেন?

কখনো আবার তাঁর গানে প্রীতির প্রাবল্য ঘটে গেছে। বলছেন তিনি—

পলক না লাগে মেরী শ্যাম বিন
হরি বিন মথুরা এসী লাগে
হে শশি বিন রৈন অনধেরী
পাত পাত বৃন্দাবন ঢুঁড়য়ো কুঞ্জ কুঞ্জ ব্রজ কেরী
উঁচে ঘড়ে মথুরা নগরী তবো বহে জমুনা গহরা
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
হরি চরনন কী চেরী।।

আপনাকে চিন্তা না করে একটি মুহূর্ত অতিবাহিত হয় না। আপনি ছাড়া মথুরা, তা কল্পনা করা যায় না। সমস্ত বৃন্দাবন খুঁজলেও আপনার মত যোগ্য একটি পুরুষের সন্ধান পাওয়া যায় না। আপনি প্রভু গিরিধারী নাগর, কবে আপনি আমার সামনে অকপট হবেন।

মীরা গাইছেন—

মেরো মন রাম হী রাম রটে রে।
রাম নাম জপঃ লীপে প্রাণী কোটিক পাপ কাট রে।
জনম জনম কী খত জু পরানে
নাম হী লেত ফটে রে।
কনক কঠোরে তুমত ভরিয়ো
পীবন কৌন নধরে

মীরা কহে প্রভু অবিনাসী
তন মন নাহি পটেরে।।

রাধা পেয়ারি, রাধা বংশী বাদকের অন্তঃপুরে হানা দিয়েছেন। কিন্তু সেই বাঁশীর সুর যে আমাকেও বিহ্বলা করে তুলেছে। আমি যে আর ঘর-সংসার করতে পারছি না। এক একবার ভাবছি, কি হবে এই উচাটনকে প্রশ্রয় দিয়ে। চোখ বন্ধ করলেই অপনার ছবি, চোখ খোলা রাখলেও আপনি।

এইভাবে সর্বত্র কেন আপনি আমিত্বের আহ্বান ছড়িয়ে দিয়েছেন? আমি এক সামান্য মহিলা। আমার ভবিষ্যত কি হবে?

মীরা বাঈ শেষ পর্যন্ত চোখের জলে শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন কিনা আমরা জানিনা। তবে একজন মানবী যে অসাধারণ কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে ইহজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে হৃৎবন্দিনী করতে পারেন আপনাকে মীরা বাঈ-এর ইতিহাস তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। আজও পথে-প্রান্তরে আমরা যখন মীরা বাঈয়ের ভজন উচ্চারিত হতে শুনি—তখন মনটা এক অনাস্বাদিত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কে ছিলেন এই বিরহিনী সন্ন্যাসিনী, যিনি চোখের জলে আবেগের আখরে লিখতেন এক-একটি ভজন। তাতে সুর সংযোজন করতেন। সোম এবং অন্তরাতে এই একটুখানি ফাঁক, বাকিটুকুর সাথে ছন্দের উপস্থিতি।

মীরা আজ আর নেই। তাঁর ভজন বেঁচে আছে। বেঁচে থাকবে যতদিন এই পৃথিবীর বুকে কিছু কৃষ্ণ প্রেমিক মানুষের আবির্ভাব ঘটবে।

সহেলী পাঞ্চালী



সেদিনের কথা ভাবতে বসলে মনের ভেতর ফাগুনের পরশ লাগে কি? চকিতে রক্তিম হয়ে ওঠে তাঁর অক্ষি সরসী? কাঁপন লাগে হৃদয়ের মাঝে? তিনি কেমন যেন আনমনা হয়ে যান?

ফেলে আসা দিনগুলো তখন তাঁর স্মরণের বীণে বেহাগের সুর তুলেছে। সেই সুরের সঙ্গে তিনি একটি অস্ফুট কান্নার অনুরণন শুনতে পাচ্ছেন। রাগিণী শোভিত বীণার মত বেজে উঠেছে তাঁর নারীত্ব, তাঁর প্রেম।

তিনি ভাবতে থাকেন. আমি কি পঞ্চস্বামীকে বরণ করে এক স্বৈরিণীর ছদ্মবেশে সেজে উঠেছি? পার্থের হৃদয়চারিণী হয়ে হয়েছি অন্যের অঙ্কশায়িণী? কিন্তু, এ তো আমার ভাবিতব্য, তাকে আমি খণ্ডন করবো কিভাবে? নশ্বর মানুষ জানে না, কিভাবে সে তার ভাগ্যের সাথে লড়াই করতে পারে? আমি তো এক সাধারণা নারী, আমার তো কোন অস্ত্র নেই। শুধুমাত্র চোখের জলকে পাথেয় করে আমি কি দুর্ভাগ্যের সাথে লড়াই করতে পারি?

জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন পাঞ্চালী। সময়টা সন্ধ্যা সমাগত। একটু বাদেই সূর্য অস্ত যাবে। একটি দিনের অবসান হয়ে গেল। পাঞ্চালী ভাবতে থাকেন, ভবিষ্যতে কি লেখা আছে আমার? আমার জীবনের সামনে অনাগত বলে আর কিছু আছে কি? আমাকে এক কাঠ-পুতুলীর মত নেচে উঠতে হয়। কখনো আমি শান্তি পাই না। আমাকে উচ্ছ্বসিত বিনোদ সঙ্গীতের চপলতায় হতে হয় নৃত্য পটিয়সী। কান্না হাসির অপূর্ব লীলাসঙ্গমে হতে হয় ধন্যা। চেতনার সবটুকুকে হত্যা করে বিপরীত অনুভূতিকে আলিঙ্গন করতে হয়। এই মুহূর্তে কোন শোক আমাকে বিন্দুমাত্র বিষণ্ণা করে না। কোন আনন্দ আমাকে আবেগপ্রবণা করে দেয় না। এমনকি, সঙ্গোপনে উচ্চারণ করেন পাঞ্চালী, এই যে প্রতি রাতে আমি, পঞ্চ স্বামীর সাথে বিনিময় করি আমার শরীর, সেখানেও এমন কোন অনাস্বাদিত সুখ থাকে না, যা আমাকে আরো বেশী শিহরিতা এবং স্পর্শকাতরা করে তুলবে!

আমি দ্রৌপদী। আমি জানি, এটাই আমার ভবিতব্য। এভাবেই পেশাদারী দক্ষতায় জীবনের বাকি দিনগুলি অতিক্রম করতে হবে।

সহসা মনে হয় পাঞ্চালীর এই জীবনে, তেমন কোন পুরুষের সন্ধান কি তিনি পেয়েছিলেন কখনো—যাঁর অবর্তমানে বুকের মাঝে কাঁপন জাগে? চোখের কোণে কোথায় লবণাক্ত অশ্রুর ইশারা দেখা দেয়?

একটি নিশ্চিত উত্তরের দিকে তখন এগিয়ে চলেছেন পাঞ্চালী অথবা দ্রৌপদী। সকলে বলে, তিনি নাকি পার্থের অনুরাগিণী। সত্যি কথা বলতে কি, এই পৃথিবীতে পার্থের মত পুরুষের সাক্ষাত পাওয়া বড় সহজ নয়। কি নেই পার্থের? আকাশের মত উদার হৃদয়। পাহাড়ের মত কঠিন প্রাজ্ঞতা। সাগরের মত চঞ্চলতা। সবদিকেই পার্থের আর কোন তুলনা মেলে না। পঞ্চস্বামীর মধ্যে পার্থ তাঁর সব থেকে কাছাকাছি আসার দুঃসাহস অর্জন করেছেন।

কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করেন, এই পৃথিবীতে তাঁর প্রিয়তম পুরুষ কে? তাহলে অনেকের অনুমানমত তিনি পার্থের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করবেন না—তখন তিনি অনায়াসে যে মহাপুরুষকে বরণ করে নেবেন, ইতিহাস ও পুরাণের পাতায় তিনি শ্রীকৃষ্ণ নামে পরিচিত।

কথাটা শুনতে অবাক লাগতে পারে। কিন্তু এটাই পৌরাণিক সত্য। কামিনী পাঞ্চালী পঞ্চ পুরুষের অঙ্কশায়িনী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। বৈদিক প্রথাকে লঙঘন করতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু মনে প্রাণে তিনি যে পুরুষকে তাঁর ইহ জীবনের সকল স্বপ্নের দ্যোতক হিসাবে চিন্তা করেছিলেন, তিনি ঐ পুরুষোত্তম কৃষ্ণ!

বারেবারে দ্রৌপদী তাঁর এই মনোবাসনা ব্যক্ত করেছেন। আচার আচরণের মাধ্যমে এমন অনুরাগ ফটিয়ে তুলেছেন, যে কোন সহৃদয় মানুষের চোখে তা ধরা পড়ে যাবে।

তবুও কখনো তিনি সেই গণ্ডি অতিক্রম করেননি যা তাঁকে কৃষ্ণের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে।

কৃষ্ণ বোধহয় দ্রৌপদীকে সস্নেহ দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন, তা না হলে কেন তিনি বারেবারে সখা রূপে দ্রৌপদীর পাশে এসে দাঁড়াবেন?

চোখ বন্ধ করে একবার ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভার সেই কলঙ্কজনক দৃশ্যটি অবলোকন করুন তো! যখন দাবা খেলাতে পরাজিত হতে হয়েছে যুধিষ্ঠিরকে, একে একে সবকিছু হারাতে হারাতে শেষ পর্যন্ত তিনি দ্রৌপদীকেও হারিয়েছেন।

পাশব দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করছেন। সভাসদদের মাঝখানে ক্রমশঃ নগ্নিকা হতে হচ্ছে ঐ যুবতীকে! দ্রৌপদী তখন চোখ বন্ধ করে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এসে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেন।

প্রেম তো এভাবেই সুকুমার প্রবৃত্তির প্রদীপশিখা জ্বালিয়ে দেয়। তাই আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে কৃষ্ণ একইভাবে দ্রৌপদীকে ভালোবেসে ছিলেন। হয়তো সেই ভালোবাসার মধ্যে কামনা বাসনার প্রলেপ ছিল না। ছিল সখ্যতার সম্পর্ক। এবং পাঞ্চালী, যখন তিনি নিজেকে সুসজ্জিতা করতেন, সযত্নে প্রসাধনে রঞ্জিতা করতেন তাঁর তনুবাহার, তখন কি ক্ষণকালের জন্যে ঐ মুকুরে কৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি দেখেননি?

অবশ্য এর আর একটি কারণ আছে। পার্থের সাথে কৃষ্ণের শারীরিক সাদৃশ্য আছে। একইরকম নীলাম্বুজ শ্যাম কলেবর। উন্নত বক্ষপট, আয়ত নয়ন, বংশী আকৃতি নাসা, পুরুষোচিত লাবণ্য।

মনের মুকুরে কার ছায়া পড়েছে? অবাক হতে হলো কামিনী পাঞ্চালীকে। তিনি দেখলেন, যাঁর ধ্যানমগ্না ছিলেন, সেই কৃষ্ণ নন, এসে দাঁড়িয়েছেন অর্জুন।

ভেতরে ডাকলেন অর্জুনকে। অর্জুন হাসলেন। ধীর পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করলেন। দ্রৌপদীর পালঙ্কের ছত্রিতে হাত রেখে মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলেন—দ্রৌপদী, তুমি ভালো আছো তো?

দ্রৌপদীর মনে হলো, বুঝি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এসে দাঁড়িয়েছেন অর্জুনের ছদ্মবেশে।

উত্তর দিলেন না তিনি। প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন—আর তুমি?

কতদিন পার্থের সাথে দেখা হয়নি তাঁর!

পালঙ্কের ছত্রি থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে পার্থ চলে এলেন দ্রৌপদীর কাছে। তাঁর উর্দ্ধবাহু স্পর্শ করলেন। চিবুক রাখলেন তাঁর মাথায়। বললেন—আজ তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে—পাঞ্চালী।

এই কথা শেষ হবার সাথে সাথে পার্থ তাঁর করতল নামিয়ে আনলেন দ্রৌপদীর কটিতে। কোমর বেস্টন করে তাঁকে কিছুদূর টেনে নিয়ে গেলেন। চকিতে তাঁর কপোলে

হাত রাখলেন। স্ফুরিত ওষ্ঠাধারের মধুর স্পর্শের শিহরণে ভরিয়ে দিলেন দ্রৌপদীর সর্বাঙ্গে। আবেশে আঁখি পল্লব কেঁপে উঠলো। পার্থের ওষ্ঠের সঙ্গে কেমন করে যে তাঁর অধর একাত্ম হয়ে গেছে তা তিনি বুঝতেই পারলেন না।

পাণ্ডবদের রীতিনীতি ভঙ্গ করে এই প্রথম অর্জুন তাঁকে সোহাগে সোহাগে শিহরিতা করতে চলেছেন। চোখ দুটি বন্ধ করলেন দ্রৌপদী। কেবলই মনে হচ্ছে তাঁর, তিনি বোধহয় দ্বিচারিণী। এভাবে পার্থের প্রেমে মাতোয়ারা হতে হতে হয়তো বা আনমনে কৃষ্ণের সাথেই রতি সঞ্চার করে চলেছেন।

অভিমান হয়েছে কি? দুরন্ত বেদনার বাষ্পোচ্ছ্বাস কি তখন পাঞ্চালীর কণ্ঠস্বরকে বিকৃত করেছে।

তিনি বলছেন—হে পার্থ, তোমার ওষ্ঠের পরশে তুমি কেন আমাকে কলুষিত করছো? কেন আমার দেহের শুদ্ধতা হরণ করছো তুমি?

পার্থ তখন বুঝি এক অবুঝ প্রেমিক। কিছুতেই দ্রৌপদীকে তিনি দূরে সরে যেতে দেবেন না।

পার্থ বলতে থাকেন—দ্রৌপদী, এমন করছো কেন? তোমার এই অদ্ভুত আচরণের কোন মানে আমি বুঝতে পারছি না।

দ্রৌপদী বলতে থাকেন—তুমি এই দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেছো? চিত্রাঙ্গদার শয্যায় নিজেকে সমর্পিত করেছো? কৌরব দুহিতাকে অঙ্কশায়িনী করে সুখ আবেশে মগ্ন ছিলে? পার্থ, কিভাবে তুমি আমাকে ভুলে গেছো?

পার্থের মনে হলো, অভিমানিনী এই নারীটির শরীর থেকে এখনই লজ্জার শেষতম আবরণ উন্মোচিত করতে হবে। তাকিয়ে থাকলেন তিনি দ্রৌপদীর মুখের দিকে। দ্রৌপদী তখন ভাবছেন, কৃষ্ণ তো একইভাবে এক নারী থেকে অন্য নারীতে নিরন্তর পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। তাহলে প্রেমিকরা কি এভাবেই প্রেমিকাকে চরম দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত রেখে অনাস্বাদিত সুখ সাগরে অবগাহন করেন?

দ্রৌপদী চোখ বন্ধ করলেন। পার্থ তখন উচ্চারণ করছেন তাঁর শাশ্বত সত্য ভাষণ। হ্যাঁ, দ্রৌপদী আমি কৌরব দুহিতা উলুপিকে স্ত্রীরূপে স্বীকৃতি দিয়েছি। চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার সাথে খেলেছি মৈথুনের খেলা। যাদব লালনা বাতীকে আমার সহধর্মিনী করেছি। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করি, তোমাকে আমি যেমন মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি। এভাবে আর কাউকে এতোখানি অনুরাগ বর্ষণ করিনি আমি।

দ্রৌপদীর সমস্ত শরীর আবার শিহরিতা হয়ে ওঠে। চোখ বন্ধ করে তিনি বুঝতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ বোধহয় একই রকম শব্দ উচ্চারণ করছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—হে দ্রৌপদী, পৃথিবীতে অসংখ্য যুবতীর সাথে আমার শরীর খেলার সম্পর্ক আছে। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, একমাত্র তোমাকেই আমি বোধহয়

সত্যিকারের সখিরূপে বরণ করেছি। তাইতো বারে বারে তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। প্রিয় বন্ধুর মত। দ্রৌপদী, এই জীবনে তোমার আমার মিলন প্রেক্ষিত নয়। আমরা চিরদিনই এইভাবে এক দেহাতীত প্রেমের পালঙ্কে শুয়ে থাকবো। দোদুল দোলায় দুলবো। বুঝি বৃন্দাবনের কুঞ্জবনে আমরা আছি।

দ্রৌপদীর রাগ মোচন হয়ে যায়। তিনি কোন কথা বলতে পারেন না। অসহায় পার্থ ভাবতে বড় ভালোবাসেন, তাঁকে দেখেই উদ্ভিন্নযৌবনা পাঞ্চালীর এই অবস্থা হয়েছে। তিনি আর কালক্ষেপ করলেন না। বুঝতে পারলেন অভিমানিনী ঐ তরুণীকে এখনই শিহরিতা করতে হবে।

পার্থ আরো এগিয়ে এলেন। ত্বরিতে শয্যপ্রান্তে চলে গেলেন পাঞ্চালী। এখন যে অনন্ত অনুরাগমন্দ্রিত মুহূর্ত এগিয়ে আসছে তাকে সাদরে বরণ করে নিতে হবে।

রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে। পার্থ এসে শয়ন করেছেন দ্রৌপদীর পাশে। ক্রমশঃ তাঁর ওষ্ঠাধর বিচরণ করছে দ্রৌপদীর গণ্ড, কপোল এলং আঁখি পল্লবে। পার্থের নিঃশ্বাসের উষ্ণতায় দ্রৌপদীর যৌবন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। মনিময় কঞ্চুলিকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেল তাঁর উন্নত দুটি শ্রীফল। পার্থের বিদ্যুৎবাহী নয়নের সামনে নিজেকে অনাবৃতা রেখে লজ্জিতা হলেন কি পাঞ্চালী?

সহসা মনে হলো তাঁর, এ বুঝি পার্থ নন, শ্রীকৃষ্ণ আবার ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। চন্দ্রালোকে তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন শিখিধারী শ্যামকে। তাঁর দৃষ্টিতে অপার তৃষ্ণার ভাষাহীন অব্যক্ততা। পার্থ রূপী শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত হয়ে উঠেছে। স্কন্ধব্যাপী কুন্তল রাশি আলুলায়িত হয়ে এসে পড়েছে তাঁর ললাটে।

পার্থের চঞ্চল আঙুল তখন স্পর্শ করেছে দ্রৌপদীর নাভিতট। পলকের মধ্যে তাঁর শরীরের শেষতম আবরণ স্থানচ্যুত হয়ে নিক্ষেপিত হয়েছে শয্যাপ্রান্তে। পার্থ গভীর আলিঙ্গনে দ্রৌপদীকে নিজের স্বেদসিক্ত বক্ষপটে ধারণ করেছেন।

উদ্দাম কামনার দুরন্ত উল্লাসে পার্থ চাইছেন দ্রৌপদীকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে।

কে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে? ছায়া ছাযা মূর্তির মত? সেই মূর্তি কি ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে দ্রৌপদীর দিকে?

দ্রৌপদী বুঝতে পারলেন, বাস্তব জীবনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সখিরূপে বরণ করেছেন, একথা ঠিক, কিন্তু অন্য একটি জীবন আছে, সেখানে কৃষ্ণ তাঁর চিরসখা এবং চিরপ্রেমিক।

অতএব পার্থের সাথে শরীর খেলা খেলে তিনি পরম দয়িতের সন্ধান পাবেন।

পার্থ বলতে থাকেন—হে দ্রৌপদী, তুমি কি আমাকে সর্বস্ব দান করতে রাজী আছো? আমার জীবন, আমার যৌবন—সব নিয়ে আমি বসে আছি। দ্রৌপদী, তুমি এসো। তোমাকে স্পর্শ করে আমি ধন্য হই।

দ্রৌপদী তখন আরো বেশী আবেগ তাড়িতা হয়ে গেছেন। বলতে থাকেন তিনি— কৌন্তেয়, তুমি হলে আমার প্রেমিক, আমি হলাম তোমার দয়িতা। আমার নারী জীবনে আমার হৃদয় যদি কোন পুরুষকে সমর্পণ করে থাকি সে হলো তুমি।

দ্রৌপদী চোখ বন্ধ করলেন। কিছু ভাবার চেষ্টা করলেন। ইতিমধ্যে পার্থ আরো কাছে এগিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর আঙুলের পরশ রাখছেন দ্রৌপদীর সর্বাঙ্গে।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে গেছে। পার্থের এই রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন কামিনী পাঞ্চালী।

নিবিড় বাঁধন কখন শিথিল হয়ে গেছে। অদ্ভুত আনন্দের আশ্লেষে ভাসছেন পাঞ্চালী। হায় কৃষ্ণ এভাবে তুমি কেন আমকে প্রতিরাতে সুরথ ক্রিয়াতে অংশ নিতে বাধ্য করো? এই বিনোদনের বিলাস প্রহর কি অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত থাকবে?

পার্থ ভাবলেন, দ্রৌপদী বুঝি তাঁরই প্রেমে এখন আত্মহারা। তিনি আরো কাছে এগিয়ে এলেন। আলিঙ্গনে মাতালিনী করে দিলেন দ্রৌপদীকে।

রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। পূব দিগন্তে একটু একটু করে আলো জাগছে। তখনো শয্যাপ্রান্তে পার্থকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাহুবন্দী করে শুয়ে আছেন দ্রৌপদী। তাঁর ওষ্ঠে ফুটে উঠেছে এক দুর্জ্ঞেয় হাসির ঝিলিক। তিনি যে তাঁর প্রাণসখা কৃষ্ণকেই এভাবে অধিকার করেছেন। হৃদয়ের অন্তঃস্থলের একটি গোপন প্রকোষ্ঠে এখন কৃষ্ণের বসবাস। এখন প্রতিনিয়ত কৃষ্ণের সাথে কথা বলতে পারেন দ্রৌপদী। হারিয়ে গেছে জীবনের সব অপূর্ণতা। বিষণ্ণতার পাখী ডানা মেলে উড়ে গেছে দূর আকাশে। এখন নীলিম প্রশান্তি জেগেছে তাঁর সব শরীরে।

উপেক্ষিতা মহিষীরা



শ্রীকৃষ্ণ চিরপ্রেমিক। একের পর এক নারীর সাথে প্রেম লীলাতে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে সহসা আমাদের মনে হতে পারে তিনি ছিলেন এক রসিক নাগর। শরীর ও মনের ধুরন্ধর খেলোয়াড়। প্রেমের খেলাতে কৃষ্ণকে পরাজিত করতে পারেন এমন পুরুষ বোধহয় আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তা সত্ত্বেও, বিবাহিত জীবনে কৃষ্ণ কি অসুখী ছিলেন। ষোলো হাজার যৌবন মদমত্তে গর্বিতা গোপিনীর সাথে যাঁর নিত্য অভিসার।—তিনি কি তাঁর মহিষীদের নিয়ে সুখী ছিলেন না?

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় আটজন ললনার নাম—যাঁরা কৃষ্ণের সহধর্মিণী হিসাবে প্রকাশিতা হতে পেরেছিলেন।

এঁদের মধ্যে প্রথমেই রুক্মিণীর নাম বলতে হয়। তিনি ছিলেন কৃষ্ণের প্রধানা মহিষী। এরই পাশাপাশি আমরা সত্যভামা, জাম্ববতী, গান্ধারী, হৈমবতী, শৈবা, প্রস্বাসিনী ও ব্রতিনীর কথা বলতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনীকারেরা বারেবারে এই অষ্ট রমণীকে উপেক্ষার অন্তরালে রেখে দিয়েছেন বা রাখতে বাধ্য হয়েছেন। তাই আমরা জানিনা, এই আট রমণীর সাথে কৃষ্ণ কি ধরণের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। অনেকে বলতে থাকেন, যেহেতু কৃষ্ণ পরকীয়া প্রেমে বিশ্বাসী ছিলেন, শ্রীরাধা সমেত অনেকের সাথে ছিল তাঁর শরীরের নিত্য খেলা—সুতরাং এই আট সহধর্মিণীকে ক্রন্দসী প্রহর কাটাতে হয়েছে। রাতের পর রাত তাঁরা এক শয্যায় শুয়ে ছটফট করতেন। যৌবনের মদমত্তে গর্বিতা হবার স্পর্ধা কখনো করেননি। তাঁদের সকলের মধ্যেই একধরণের সৌকুমার্য শ্রী চোখে পড়তো।

কখনো কখনো হয়তো শ্রীকৃষ্ণ আসতেন শয্যা প্রান্তে। সেই রসিক নাগরকে দেখে হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠতো রুক্মিণীর। কত কথা মনে জমে আছে—শ্রীকৃষ্ণ কি তা শ্রবণ করবেন?

সত্যভামা বুঝতে পারতেন, যে কোন কারণেই হোক এই রসিক পুরুষটির মন আজ ভালো নেই। অতএব, হৃদয় উৎসারিত সকল আলোড়নকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে। সারারাত এক ব্রতচারিণীর মত সময় কাটাতে হবে।

অথবা জাম্ববতী—কখন তাঁর ঘরে এসে পা রাখবেন শ্রীকৃষ্ণ, সেই প্রতীক্ষাতে কাটান তিনি রাতের অতন্দ্র প্রহর। ঘুমোতে ভয় লাগে তাঁর পাছে শ্রীকৃষ্ণ এসে ফিরে যান। দ্বারপ্রান্তে বাতাসের শব্দ হলে শিউরে ওঠেন। চোখ বন্ধ করেন। অন্ধকাবে হেঁটে যান। ভাবেন বোধহয় কৃষ্ণ এসেছেন। আলো জ্বালতে দ্বিধা তাঁর। কৃষ্ণ অন্ধকার পথের পথিক হতে ভালোবাসেন। চাঁদের আলোয় উদ্ভাস চারপাশ। অলৌকিক জ্যোৎস্নাতে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। রাত পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে। এমনই একটি পরিবেশ তো পছন্দ করেন ঐ পুরুষোত্তম।

অনেকক্ষণ ধরে এইভাবে প্রতীক্ষায় মগ্ন থাকেন জাম্ববতী। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারেন, আজ রাতে আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শয্যাপ্রান্তে এসে দাঁড়াবেন না।

নীরবে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন জাম্ববতী। শয্যাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেন। চোখ দুটি বন্ধ রাখেন। সেখানে তখন অশ্রু নির্গমন শুরু হয়ে গেছে। হায় কৃষ্ণ, তুমি এখন কোন কামিনীর কুঞ্জকাননে বিহার করছো? রতি রসভারে অবনতা সেই মেয়েটিকে হিংসে করতে ইচ্ছে করছে আমার। আমি যদি তোমাকে স্বামী হিসাবে বরণ না করতাম, তাহলে হয়তো তুমি পরকীয়া প্রেমে মত্ত হতে আমার সাথে!

এবং গান্ধারী, এই মহিষীটিকে কখনোই সুচোখে দেখেননি কৃষ্ণ। বরং বলা যেতে পারে, তাঁর প্রতি নিক্ষেপ করেছেন অবহেলা। গান্ধারীকে তাই আমরা উপেক্ষিতা নারী

হিসাবে দেখতে পাই। কখনো সখনো তাঁকে নিয়ে দু একটি গাথা লেখা হয়েছে। সেখানে তিনি অবহেলিতার ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। কৃষ্ণের সাথে সহবাস? সেকথা জানা যায় না। আমরা অনুমান করতে পারি, কোন এক অজ্ঞাত কারণে গান্ধারীকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শয্যাসঙ্গিনী হবার সামান্যতম সৌভাগ্যটুকু লেপন করেননি। কি দোষ করেছিলেন গান্ধারী? তিনি কি ছিলেন অভিশপ্তা? তাহলে, কৃষ্ণ কেন তাঁকে বরণ করেছিলেন সহধর্মিণী হিসাবে? কৃষ্ণ তো বিবেচক পুরুষ। বিভিন্ন নারীর মধ্যে একটি সংযুক্তি সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। সীমা ও অসীমের মেলবন্ধনে মগ্ন ছিলেন।

হায় গান্ধারী, তোমার মুক মুখে যদি ভাষা থাকতো, তাহলে তুমি বোধহয় এই বেদনার মহাকাব্য রচনা করতে পারতে। তা যখন সম্ভব হয়নি, তুমি চিরদিনই এইভাবে রহস্যবতী হয়ে থাকবে।

হৈমবতী প্রগলভা এবং তন্বী তরুণী। শরীরের প্রাখর্যে অনেককে হারিয়ে দেওয়ার স্পর্ধা রাখেন। এই হৈমবতীর সাথে যখন শ্রীকৃষ্ণের দেখা হতো, শ্রীকৃষ্ণ অকারণে কথাবান হয়ে যেতেন। কত কথা জমে আছে, হৃদয়ের মধ্যে। সব মহিলার সাথে কি কথা বলা যেতে পারে? শরীরের খেলা তো শুরু হলেই শেষ হয়ে যায়। কি থাকে তার স্মৃতি?

কিন্তু হৈমবতী কথার পরে কথা সাজিয়ে একটি নান্দনিক কথামালা রচনা করতে পারেন। কৃষ্ণ শোনেন—হৈমবতী গল্প করেন। কত গল্প জানেন তিনি। রূপকের কথা, জাতকের কথা, পুরাণের কথা।

এমনভাবেই কি অতিবাহিত হয়ে যায় অন্তরঙ্গ আলাপ চারিতার মধ্যরাত? শরীর এসে কি শরীরের সাথে মিতালী পাতায় না? পূর্বাকাশে একটি দুটি তারার মৃত্যু হতে চলেছে। চাঁদের বুক থেকে উড়েছে শেষতম জ্যোৎস্না। তার মানে, পৃথিবী এবার আর একটি নতুন দিনের জন্ম প্রত্যক্ষ করতে চলেছে।

হায় হৈমবতী, এভাবেই অতিক্রান্ত হয়ে গেল মিলন পিয়াসী রাত? শ্রীকৃষ্ণ আবার কবে এসে তোমার কুঞ্জকাননে পা পাখবেন? ততদিন কি তোমাকে এভাবেই কাটাতে হবে একাকীত্বের ক্রন্দসী প্রহর?

শৈবার কথা মনে কি পড়ে আমাদের? এক অনন্যা রূপ-ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও মনে প্রাণে ছিলেন তিনি উদাসিনী। সংসারে আছেন অথচ নেই। মাটির ওপর পা রেখে হাঁটছেন না। মনে হচ্ছে তিনি যেন বাতাস সমুদ্রে সাঁতার কাটছেন। এই শৈবা আর শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে দুটি একটি গল্পকথা রচিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনীকারের শৈবাকে উপস্থাপিত করেছেন এক সহজ-সরল সুন্দরী মহিলা হিসাবে। যে শৈবার চোখে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের সবথেকে শক্তিশালী পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণের সেবার মধ্যেই শৈবা তাঁর নারীত্বের চরম সুখ অন্বেষণ করেছেন। যখনই কৃষ্ণ এসে শৈবার সাথে দেখা করেন,

শৈবা যেন জননী সত্তাকে মুঠোবন্দী করেন। কৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। কোথায় কেমন ছিলেন তিনি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চান। দীর্ঘ অদর্শনের পর কৃষ্ণ মিলনে শৈবা কেমন যেন হয়ে যান। নারীত্বের সবকটি দরজা খুলে দেন। সেখানে কৃষ্ণ এসে উপবেশন করেন। ক্ষণকাল স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবেন শৈবার দিকে। গালে হাত রেখে অবাক হয়ে ভাববেন, হায়, আমি তো ভেবেছিলাম, পৃথিবীর সকল মেয়েই কামিনী। তারা বাসনা শক্তির দ্বারা চালিতা। কিন্তু, এখন তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, যৌবনের প্রথম প্রহরে ভুল হয়ে গিয়েছিল আমার, যদি সেই ভুল শোধরাবার কোন উপায় থাকতো, তাহলে এখনই আমি সকলকে চীৎকার করে জানিয়ে দিতাম আমার মনোবাসনার কথা। আরো বলেছিলেন তিনি—শৈবা, এই পৃথিবীতে সব মেয়ের সাথে শুধুমাত্র শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে নেই। কিছু কিছু ললনা আছে, যাদের সাথে মানসিক প্রীতির বন্ধন গড়ে তুলতে হয়। আমার সৌভাগ্য, আমি তোমার মত ভাগ্যবতী নারীর সন্ধান পেয়েছি।

ব্রতিনীকে আমরা এই আট মহিষীর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা হিসাবে অভিহিতা করতে পারি। সত্যিই তো, যখন কৃষ্ণ ঘরণী হয়ে ব্রতিনী আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তখন সবেমাত্র কৈশোর কালের রোমাঞ্চিত অধ্যায় পার হয়ে তারুণ্যে প্রবেশ করেছেন। তখনো শরীর ধরে রেখেছে কিশোরী সুলভ চাপল্য এবং অকারণ উল্লাস। আঁখিপট থেকে তখনো নির্বাপিত হয়ে যায় নি রোম্যান্টিক ভালোবাসার আগুন আঁচ। ক্রন্দসী এই মেয়েটি নিজের সবকিছু নিঃস্বার্থে সঁপে দিতে চেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের হাতে। সহেলীদের মুখে স্বামী সম্পর্কে যা শুনেছেন তিনি, স্বামীর একটি রূপ এঁকেছেন তার কষ্ট কল্পিত চোখের পাতায়।

কিন্তু বাস্তবের কৃষ্ণের সাথে স্বপ্নের কৃষ্ণের কোন মিল নেই। প্রথম প্রথম ক্রন্দসী হয়ে উঠতেন ব্রতিনী। আত্মীয় পরিজনদের কাছে মনোবেদনার কথা ব্যক্ত করতেন। তাঁরা নানাভাবে ব্রতিনীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতেন। অনেকেই বলতেন, ব্রতিনী, যার সাথে তুমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছো, তিনি হলেন মহাদেবতা। এই পৃথিবীর বুকে অনেক কাজ আছে তাঁর। তিনি শুধু প্রিয়মহিষীদের সাথে রমন্য করবেন, নতুন একটি প্রাণের ভ্রূণ সঞ্চার করবেন, তা কখনো হতে পারে না। অতএব তোমাকে এভবেই নিদ্রাবিহীন রাত কাটাতে হবে। একাকিনী থাকার মন্ত্রমালা সযত্নে শিখতে হবে। তোমার তো ভাগ্য ভালো। শ্রীকৃষ্ণ তোমার সাথে এসে কথা বলার মত সময় রেখেছেন। আগে হলে, তিনি আরো বেশী উদাসীন হয়ে পড়তেন। সংসার ধর্ম পালনের জন্যে মোটেই চিন্তিত হতেন না।

একি আমার সৌভাগ্য নাকি দুর্ভাগ্য? ব্রতিনী ভাবতে থাকেন? আয়নাতে নিজের

মুখের প্রতিচ্ছবি দেখেন। সেখানে তখন আনমনে কোন এক শিল্পী বোধহয় শূন্যতার ক্যানভাসে ছবি এঁকে চলেছেন।

ব্রতিনী বুঝতে পারেন, তাঁর জীবনের এই সুদুঃসহ যন্ত্রণার প্রহর সহজে অতিবাহিত হবেনা। আরো অনেক সময় কাটাতে হবে। আরো অনেকগুলি ভাবনার স্তর পার হতে হবে। তবেই তিনি অনন্ত শান্তি পাবেন।

সবশেষে আমরা রুক্মিণীর কথা আলোচনা করতে চলেছি।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনীকারেরা রুক্মিণীকে একটি আলাদা আসনে স্থান দিয়েছেন। তিনি যে শুধুমাত্র ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রধান মহিষী, তা নয়, আপন চরিত্রের ঔদার্যে অনেককে বশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরই পাশাপাশি অসম্ভব বুদ্ধিমতী ছিলেন তিনি। বুদ্ধির লড়াইয়ে অনেককে পরাজিত করে দিয়েছিলেন। আবার অনেকের সাথে পাতিয়েছিলেন নিদারুণ সখ্যতার সম্পর্ক।

কৃষ্ণের সাথে তাঁর বিবাহ এবং তার পরবর্তী সময় কৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত অবহেলাকে গলার হার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন রুক্মিণী।

শরীরী প্রেমের মত তীব্র ছিল না রুক্মিণী বোধহয় বসন্ত বাতাস। সবসময় মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতে থাকবেন। তিনি আছেন, তা বোধগম্য হবে না। যতক্ষণ তিনি থাকবেন, অন্তরালে একদিন তিনি চলে গেলেই পৃথিবী জুড়ে নেমে আসবে শত শতাব্দীর অন্ধকার।

এই রুক্মিণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কি ধরণের মনোভাব পোষণ করতেন সে বিষয়ে শেষ কথা আমরা এখনো জানতে পারিনি। কাব্যে উপেক্ষিতার মত রুক্মিণীও ছিলেন তাঁর জীবনে অবহেলিত চরিত্র। শ্রীকৃষ্ণ তার প্রেম ও ভালোবাসার সিংহভাগ উজার করে দিয়েছিলেন শ্রীরাধিকাকে। তাঁদের প্রেমকাহিনী নিয়ে একটির পর একটি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। সারা পৃথিবীর প্রেম বুভুক্ষু মানুষের কাছে তাঁরা হলেন চিরন্তন প্রেমের যুগ্ম প্রতীক। কিন্তু এরই পাশে রুক্মিণী, তিনি কি রাধার চরিত্র মাধুর্যে অবগুণ্ঠিতা হয়ে যাননি।

তখনকার নিয়মানুসারে, এক পুরুষের জীবনে প্রধানা মহিষীর ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কিন্তু ঐ রুক্মিণীকে তিনি কি সেই চোখে পর্যবেক্ষণ করতেন, রুক্মিণীর জন্যে আলাদা প্রাসাদ কি নির্মাণ করেছিলেন?

ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাই, এমন কাজ কিন্তু করেননি শ্রীকৃষ্ণ। সহসা প্রশ্ন জাগে, তিনি কি রুক্মিণীকে পছন্দ করতেন না? কিন্তু, অন্তঃপুরে যদি এমন একজন যুবতী স্ত্রী থাকেন, তাহলে কোন পুরুষ কি পরনারীর প্রতি আসক্ত হতে পারেন?

অনেকে বলে থাকেন, যৌন জীবনযাপনে রুক্মিণীর প্রবলতম অনীহাই কৃষ্ণকে বহুবল্লভা করে তুলেছে। এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আমারা উত্তেজিত হয়ে উঠি। ভাবতে চেষ্টা করি, সত্যি সত্যি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পত্নীর উদাসীনতাকে মাথা পেতে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন কিনা? এবং তজ্জনিত যে ক্লান্তি ছিল তাঁর শরীরের কোষে কোষান্তরে তা অলনোদনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন ঐ গোপীনীদের কাছে? একটির পর একটি নারী এসে তাঁকে অনন্ত সুখ দান করতেন। এর বিনিময়ে কি দিতেন শ্রীকৃষ্ণ? ঐহিক কোন সম্পদ? নাকি পারমার্থিক শান্তি? অথবা দুটোই?

এ বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করলে রুক্মিণী হাসতে আসতে জবাব দিতেন—আমি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের ঘরণী হবার বিরলতম সৌভাগ্য অর্জন করেছি। ঈশ্বরের কাছে আমার কি আর কিছু চাওয়ার জিনিস থাকতে পারে?

ধন্য রুক্মিণী। ধন্য তাঁর স্বাধ্বী চরিত্র। এভাবেই তিনি মনের সবকটি উত্তেজনাকে ক্রমশঃ দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁর পতি হিসাবে বিরাজ করছেন, তিনি কি অন্য কোন কিছুর প্রতি আসক্ত হতে পারেন?

বয়সেও রুক্মিণী ছিলেন অন্যান্যদের থেকে বড়। সর্বদা তাঁকে অনেক কঠিন কাজ সম্পাদন করতে হতো। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে যখনই কোন সঙ্কটজনক মুহূর্ত ঘনীভূত হয়েছে, রুক্মিণী পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন স্বপ্ন সহচরীর মত। সঙ্কট প্রশমনের চেষ্টা করেছেন। নিজের বুদ্ধি এবং মেধার সাহায্যে। অথচ যখন সঙ্কট অপসৃত হয়ে গেছে, রুক্মিণী আবার চলে গেছেন পর্দার অন্তরালে। এভাবে ক্ষণে-বিক্ষণে কৃষ্ণকে ভালোবেসেছেন রুক্মিণী। এই ভালোবাসা ছিল একেবারে অন্যরকম।

গোপিনীরা হয়তো এই আপাত কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। কিন্তু আট রমণী, ভাগ্য দোষে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী হিসাবে অবতীর্ণা হয়েছিলেন, যদি তাঁদেরকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং একটির পর একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাঁরা অকপটে স্বীকার করবেন—শ্রীকৃষ্ণ সকল তরুণীর স্বপ্নের প্রেমিক হতে পারেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে তাঁর মত নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন পুরুষের সাক্ষাত সহসা মেলে না।

এই দেখো, আমরা আট ললনা আমাদের অনন্ত রূপ আর যৌবনের সীমাহীন ভাণ্ডার নিয়ে একাকিনী রাত জাগতে বাধ্য হচ্ছি। এবং শ্রীকৃষ্ণ, আসি, আসবো করেও তিনি আসেননি। আকাশ থেকে খসে পড়া উল্কার মত হারিয়ে গেছেন।

তবুও কি শেষ হবে আমাদের প্রতীক্ষার রুদ্ধ প্রহর? আমার জানি, একদিন শ্রীকৃষ্ণ আসবেন, গোপিনীরা তখন তাঁকে আর ধরে রাখতে পারবেন না। শ্রীরাধিকার প্রেমাঞ্চলে তিনি মুখ ঢাকবেন না। তিনি যে আমাদের স্বামী। আমরা যে তাঁকে সপ্তপদী বাঁধনে বেঁধেছি। অতএব, হৈমবতী কিংবা রুক্মিণীর কাছে তাঁকে অন্তত একবারের জন্যে হলেও আসতে হবে।

চিরন্তনী শ্রীরাধিকা



কৃষ্ণ যখন প্রেমিক, এই আখ্যায়িকা লিখতে গিয়ে এবার আমরা তাঁর জীবনের সব থেকে জটিল অধ্যায়ের ওপর আলোকপাত করতে চলেছি।

এই পৃথিবীতে যাঁরা শাস্ত্রবিদ হিসাবে পরিচিত, তাঁদের চোখে রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কে একটি নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত হয়েছে। তাঁরা মনে করে থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ হলেন অসীম, আর রাধা হলেন সীমা বা সসীম। সীমার সাথে অসীম নিরন্তর মেলবন্ধন ঘটাতে চায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই যুগলবন্দী বাদন শোনা যায় না। কিন্তু কোন কোন সময়ে সীমা ও অসীম মিলেমিশে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

পুরাণকারেরা বলে থাকেন, শ্রীরাধিকা ছিলেন কৃষ্ণের সম্পর্কিতা। বয়সে তাঁর থেকে বড়, বিবাহিতা, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে হরণ করেছিলেন, কিভাবে মধুর মুরলী টানে রাধার তন্দ্রা ভেঙে দিয়েছিলেন, তাঁকে অধিকার করার জন্যে নানা দোষণীয় ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলেন, এসব বহু শ্রুত গল্পকে আমি আর নতুনভাবে উপস্থাপিত করতে চাইছি না।

আমি শুধু বলতে চাইছি, প্রেমিক কৃষ্ণ, শ্রীরাধার সান্নিধ্যে আসার পর থেকেই প্রেম সত্তাকে নতুনতর আঙ্গিকে বিধৃত করেছিলেন। শরীরী থেকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অশরীর। অন্যান্য গোপিনীদের সাথে প্রেমলীলার সময় আমরা কৃষ্ণের যে দেহজ বাসনার স্ফুরণ দেখতে পাই, রাধার ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটি ঘটেনি।

রাধাকে তিনি নানাভাবে অধিকার করার চেষ্টা করেছেন, একথা ঠিক, তবুও এই যাচ্না মধ্যে কোন তীব্র শরীর-আকাঙ্খা নেই। কিন্তু সেই ধরণের ঘটনা ঘটার যথেষ্ট কারণ ছিল। যখন শ্রীরাধিকা এবং কৃষ্ণের মধ্যে প্রথম দেখা হয়েছিল, তখন তাঁরা দুজনেই তারুণ্যের মাতাল মনের বাসিন্দা। প্রথম দর্শনেই শ্রীরাধিকাকে কি ভালো বেসেছিলেন কৃষ্ণ? যখন শুনেছিলেন, শ্রীরাধিকা সম্পর্কে তাঁর মামীমা এবং গুরুজনস্থানীয়া, তখনো শ্রীকৃষ্ণের প্রেম এতোটুকু নির্বাপিত হয় নি। ওই জীবনে অনেক নারীকে ভোগ করেছেন তিনি। অনেকের সাথে খেলেছেন শরীরহীন প্রেমের খেলা। অনেককে অভিষিক্ত করেছেন সুধারসে। অনেকের চোখে ভালোবাসার অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু শ্রীরাধিকা, তিনি যখন কাছে আসেন, শ্রীকৃষ্ণের মনে হয় সর্বশরীরে শিহরণ জেগেছে! তিনি যখন তাঁর অসাধারণ কণ্ঠমাধুর্যে বাতাস প্রকম্পিত করেন, কৃষ্ণের মনে হয়, আজ বুঝি ঈশান কোণে ঝড় উঠবে। এই শ্রীরাধিকা, এমনভাবেই কৃষ্ণকে দুর্বল করে তুলেছেন।

খাওয়া ভুলে গেছেন কৃষ্ণ। ভুলে গেছেন নীল যমুনার জলে, অবগাহন করার কথা। সর্বক্ষণ তাঁর মনে একটি মাত্র চিন্তা, তাঁর চেতনায় একটিমাত্র ইচ্ছার স্ফুরণ, কিভাবে রাধাকে অধিকার করা যেতে পারে!

কৃষ্ণ সেজেছেন নানা ছদ্মবেশে। কখনোবা রাখাল রাজা, কখনো নিঃস্ব ভিখারী। কখনো দৃপ্ত সম্রাট। হাতে স্থাপন করেছেন তাঁর মন্ত্রপূত বাঁশীটি, সুর উঠেছে। সুর ছড়িয়ে পড়েছে নিশান্তিকার বাতাসে। নিদ্রিতা রাধার ঘুম ভেঙে গেছে। হা কৃষ্ণ করে তিনি উঠে বসেছেন। কোথায় কৃষ্ণ? পাশে শুয়ে থাকা স্বামীর শরীর থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাস তাঁকে স্পর্শ করেছে। হায় স্বামী, আমি তোমার প্রতি অনুরক্তা থাকতে পারলাম না। পাপের এক ভূজঙ্গ প্রবেশ করেছে আমার শরীরে।

পরক্ষণেই থরথর করে কেঁপে উঠেছেন তিনি। ভেবেছেন দর্পণে মুখের প্রতিফলন দেখতে দেখতে, হায়, ঈশ্বরের অমোঘ আদেশে আমাকেও দ্বিচারিণী হতে হলো। আমার সাথে পথচলতি গণিকা বা দেহপোজীবিনীদের কোন তফাত নেই। তারাও আমার মত একাধিক পুরুষে উপগত হয়ে থাকে। আমি আয়ান ঘোষের সাথে শরীর সংযোগ করছি। আবার শ্রীকৃষ্ণের ডাকে সাড়া দিয়ে সংসার বন্ধন ছিন্ন করার কথায় চিন্তা করছি। শ্রীকৃষ্ণ তুমিই বলে দাও, কিভাবে আমি আমার মনের এই সুদুঃসহ কঠিন কঠোর জ্বালা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবো।

ভগবান হেসেছেন দুর্জ্ঞেয় হাসিতে। বলেছেন তিনি—-রাধা যমুনার তীরে তোমাকে দেখা করতে হবে প্রাণসখা কৃষ্ণের সাথে। তবেই তুমি মুক্তির পথ খুঁজে পাবে। সেই কৃষ্ণ আবার এসে কেন আমার ধ্যানমগ্নতা ভেঙে দিচ্ছেন? বাঁশীর সুরে সুরে এমন মায়াবী ঝঙ্কারের সৃষ্টি করেছেন, আমি কোন কাজ করতে পারছি না।

শ্রীরাধিকার কাতর এই অভিব্যক্তি পৌঁছে গিয়েছিল অনেকের কানে। এমনকি, তিনি যাতে নির্বিঘ্নে শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিলিত হতে পারেন, তাই প্রকৃতির পটে ঘটে গেছে নানা পরিবর্তন।

অবশেষে সন্ধ্যা এসেছে। শ্রীরাধিকা এগিয়ে চলেছেন। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে অনুসরণ করছেন শ্রীকৃষ্ণ।

এরমধ্যে কোন প্রতারণা নেই। নেই মিথ্যে ভাষণ। পথ চলতে চলতে কোথায় এসে থামলেন শ্রীরাধিকা? এই ঘন বনাঞ্চলের মধ্যে? কৃষ্ণ এগিয়ে এসেছেন। কদম গাছটি তাঁর বড় প্রিয়। সেই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকলেন শ্রীকৃষ্ণ। বাঁশীতে সুর তুললেন। কাছে আসার এবং ভালোবাসার। সেই সুর কি স্পর্শ করেছে শ্রীরাধিকাকে? আর ভালো লাগছে না এই জীবন। সুদুঃসহ পাষাণ ভার। কৃষ্ণ, এসো কৃষ্ণ, তার সাথে আমি একত্রে মিলিত হবো। রচনা করবো ভালোবাসার নতুন একটি গীতি কবিতা।

এইভাবে কতবার শ্রীরাধিকা মিলেমিশে একাত্ম হয়ে গেছেন শ্রীকৃষ্ণের সাথে। কত মুহূর্ত তিনি কাটিয়েছেন নিরালায়। কথা বলে এবং কথার জাল রচনা করে।

নিশিরাত, বর্ষা নেমেছে, ভেকের ডাক শোনা যাচ্ছে। কোন মানুষ কি জাগরিত অবস্থায় আছেন?

এই বৃষ্টিলাঞ্ছিত মধ্যরাতেও ছপাৎ ছপাৎ শব্দ করে এগিয়ে চলেছেন সদ্যযুবতী শ্রীরাধিকা। তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এক অদ্ভুত আলোক ধারায়। শেষ পর্যন্ত তিনি পরম দয়িত শ্রীকৃষ্ণের মনের রহস্য উদঘাটনে সমর্থ হয়েছেন। আজ তাঁর বড় আনন্দের দিন।

যে কৃষ্ণকে পাবার জন্যে যাদব পুরনারীরা অন্তহীন তপস্যা করতে ভালোবাসেন—সেই কৃষ্ণ কিনা এভাবে স্বেচ্ছাবন্দী হয়েছেন? ঈশ্বরের কি অদ্ভুত লীলা!

এভাবেই প্রথম শ্রীরাধিকা মিলিত হয়েছিলেন কৃষ্ণের সাথে এক প্রণয়লীলাতে। সাক্ষী ছিল আকাশের ধ্রুবতারা, সাক্ষী ছিল বনের বনস্পতি, এবং অবলা কিছু প্রাণীর দল।

তারপর থেকেই, মধ্যরাতে বাঁশীর শব্দে উচাটন মন হতো শ্রীরাধিকার। ধীরে ধীরে অঙ্গ থেকে সমস্ত অলঙ্কার খুলে ফেলতেন তিনি। পাছে তাঁর পদধ্বনি এক-একটি তব শব্দের সৃষ্টি করে। সন্তর্পণে তাকিয়ে দেখতে হতো তাঁকে, আয়ান ঘোষ ঘুমিয়ে পড়েছেন কিনা। অন্যান্যরা এখন কি ঘুমের জগতে প্রবেশ করেছেন। প্রিয় মিলনের জন্যে এমনই নিস্তব্ধ মুহূর্তটি বেছে নিতে হয়।

শ্রীরাধা, কৃষ্ণ সন্দর্শনে বের হবেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন তিনি। মন্দাক্রান্তা ছন্দে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাচ্ছেন। কেবলই মনে হচ্ছে তাঁর পশ্চাদগামী ঐ বাতাস বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলকে ধারণ করেছে।

জাগছে শঙ্কা এবং শিহরণ। তিনি কি নিজ প্রয়াসে শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জবনে প্রবেশ করতে পারবেন? মিলিত হতে পারবেন ঐ পুরুষোত্তমের সাথে?

ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ রচনা করেছেন তাঁর পাক অন্ন। রাধার জন্যেও কিছুটা তুলে রেখেছেন। এক অপূর্ব সাংসারিক পরিবেশ! কে বলবে, তাঁরা হলেন স্বর্গের দেবতা। মনে হচ্ছে দেখে, তাঁরা বুঝি এই পৃথিবীর বাসিন্দা। প্রেম এসে ধরা দিয়েছে। প্রেমিক এবং প্রেমিকা সঙ্গোপনে প্রহর কাটাচ্ছেন। এখানে তৃতীয় ব্যক্তির অনভিপ্রেত উপস্থিতি কি থাকা উচিত?

এভাবেই রাধা অসংখ্যবার বন্দী হয়েছেন কৃষ্ণের বক্ষ-পিঞ্জরে। সেই বন্দীত্বকে মাথার মুকুট করে রেখে দিয়েছেন সযত্নে।

শ্রীকৃষ্ণকে অনেক গোপিনীর সাথে সঙ্গত করতে হয়েছিল। কিন্তু এতোদিন মনের মধ্যে ছিল অতৃপ্তির ঢেউ। তিনি ভেবেছিলেন, শ্রীরাধিকা ছাড়া অন্য কোন নারীর প্রতি

অনুরক্ত হবেন না। কথা দিয়েছিলেনও শ্রীরাধাকে। হায়! দুভাগ্য তাঁর, শেষ পর্যন্ত এই কথা তিনি রাখতে পারেননি। তখন তাঁকে অদ্ভুত আকর্ষণে ডাক দিয়েছে ললিতা-বিশাখার দল। বৃথাই তারা রচনা করেছে ভালোবাসার পর্ণকুটির। বালির আখরে লিখেছে কৃষ্ণের নাম। এই ভক্তির পরকাষ্ঠা দেখে অবাক হতে হয়েছে শ্রীরাধিকাকে। ভেবেছেন তিনি গালে হাত দিয়ে, হায় আমিও কি ওদের মত কৃষ্ণকে ভালোবাসতে পারিনা? আমি কেন তাঁর আলিঙ্গনের ভয়ে শিহরিতা হয়ে থাকি? তাঁর মধুর বাক্য শ্রবণ করবো বলে উৎকণ্ঠিতা থাকতে পারিনা কেন? সবসময় কেবলই আমার মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ যে এইভাবে অবিবেচকের মত আমার সান্নিধ্য প্রার্থনা করছেন, এতে হিতে বিপরীত হবে। সত্যি কথা বলতে কি, আমিতো এক বিবাহিতা পত্নী। একজনের অঙ্কশায়িনী। তাঁর সাথেও আমাকে অসংখ্যবার প্রেমের খেলা খেলতে হয়েছে।

তখনই কোথাও শোনা গেছে দৈববাণী। রাধার সমস্ত শরীর শিহরিতা হয়েছে অনাস্বাদিত আনন্দে। ভেসে গেছেন তিনি। কে যেন বলেছে—শোন রাধা, এই জীবনে শ্রীকৃষ্ণকে একক অধিকার করার অভিলাষ পরিত্যাগ করো। তিনি এক আশ্চর্য শক্তি, দৃপ্ত, পৌরুষের শেষহীন প্রতীক। তাঁকে এভাবেই বারেবারে শরীর দান করতে হবে।

কিন্তু, এতে কি মনের গোপনে জমবে না হতাশার কালো মেঘ? মনে কি হবে না, একটি দিবসের অন্তে এই জীবনে অনেক কিছুই করার ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করে উঠতে পারিনি আমি।

তখন বিধৃত হচ্ছে শ্রীরাধিকার হতাশ কণ্ঠস্বর। স্বপ্ন কি ভেঙে গেছে তাঁর? দুর্জ্ঞেয় হাসি তখন সযত্নে ধারণ করেছেন নীলকুমার। হাসতে হাসতে তিনি এগিয়ে আসছেন। শ্রীরাধিকা ভেবেছিলেন, যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট হচ্ছে তাঁর শরীরে, সবকিছু কেন্দ্রীভূত করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিহত করবেন। কিন্তু একি! যিনি এসে সহসা অধিকার করেন হৃদয়, তাঁর সাথে কি কুব্যবহার করা যেতে পারে?

তাইতো আমরা এখন দেখছি, শ্রীকৃষ্ণ আর রাধা এক অপূর্ব মিলন সন্ধ্যায় পাশাপাশি অবস্থান করছেন। মাঝেমধ্যে শ্রীরাধিকা কেঁপে উঠছেন শ্রীকৃষ্ণের আঙুলবাহিত খুনসুটিতে।

যে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য নারীর সাথে শরীর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তিনি কেন বারেবারে রাধিকার জন্যে উৎকণ্ঠিত চিত্ত হয়ে থাকেন? কেবলই মনে হয় তাঁর, রাধিকা বিরহে বোধহয় সময় আর অতিবাহিত হবে না। সত্যি কথা বলতে কি—যৌবনের মদমত্ত বিলাসে রাধিকা যে সর্বশ্রেষ্ঠা, এমন কথা বলা যায় না। মানসিক প্রক্ষোভেও যথেষ্ট ঐশ্বর্য শালিনী তিনি নন। তবুও তাঁর প্রতি এক অজানা আকর্ষণ অনুভব করেন শ্রীকৃষ্ণ। এর কারণ কি?

একদিন চক্ষুদুটি নিমীলিত করে এর উত্তর অন্বেষণ করতে চেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

সহসা মনে পড়ে গিয়েছিল তাঁর, শ্রীরাধিকার সাথে তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। অন্যান্য গোপরমণীদের সাথে তিনি কৌতুককর আনন্দাভিসারে মেতে ওঠেন একথা ঠিক। তবুও শেষ সত্যি হিসাবে যদি কোন শব্দ উচ্চারণ করতে হয় তাহলে বলতেই হবে, রাধাকৃষ্ণের মিলনের মত পবিত্র দৃশ্য আর কিছু হতে পারেনা।

এই মিলনে সমস্ত অহম বোধের অন্তর্ধান ঘটে যায়। পৌরুষ অথবা নারীত্ব জেগে থাকে না। থাকে শুধু এক অদ্ভুত নিরাপত্তাময় নিশ্ছিদ্র সখ্যতা বোধ। যে বোধ এখনো পৃথিবীর নারী এবং পুরুষকে একত্রে সংযুক্ত রেখেছে। যে বোধ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আছে বলেই আমরা বিশ্বমানব হয়ে যেতে চাই। নারীকে মুঠোবন্দী করি। পুরুষকে ভাবি পরমকাঙ্খিত ধন।

আপাতত তাঁরা ব্যস্ত আছেন যমুনা তীরে। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। পূর্ণিমার আকাশে রূপোর থালার মত চাঁদ উঠেছে। রাতপাখীর কণ্ঠ থেকে ভেসে আসা কাকলি শোনা যাচ্ছে। ধরা পড়ার ভয় হারিয়ে ফেলেছেন শ্রীরাধিকা। এখন যদি সত্যি সত্যি কেউ এসে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনে, তাহলেও শ্রীরাধিকা বিন্দুমাত্র কুপিতা হবেন না। তিনি শিখেছেন সেই মহামন্ত্র। এই জীবনে যে কটি বস্তুকে ত্যাগ করতে হয়, হিংসা অথবা ক্রোধ তার অন্যতম।

অতএব শ্রীরাধিকার ওষ্ঠাধরে এখন ফুটে উঠেছে প্রশ্রয়ী হাসির চিহ্ন। হাসছেন, দেখাচ্ছেন বরাভয় মুদ্রা। এখন কি আর শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন? এখন তাঁকে ঐ ছলনাময়ী রমণীর অভিলাষ পূর্ণ করতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে এক দুরন্ত দূর্বার বৈশাখী ঝড় হয়ে।

কৃষ্ণপ্রেমিক চৈতন্য



নীলাচল, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলানিকেতন। গৌরাঙ্গ লীলার গৌরব চিহ্ন সাদরে বহন করে এখনো অতীতের মধুর স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে।

আমরা নদের নিমাইয়ের কথা বলতে চলেছি। নিমাই শ্রীকৃষ্ণকে সখা রূপে প্রার্থনা করেছিলেন। মাঝে মধ্যেই ভাব-উন্মাদে তিনি হয়ে যেতেন শ্রীরাধিকা। কল্পনা করতেন, প্রাণের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের সাথে বুঝি তাঁর শারীরিক সংযুতি হয়ে গেছে। তিনি লাভ করেছেন এক অনাস্বাদিত আনন্দ।

এভাবেই তখন সময় কাটছে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের। জগত তাঁর কাছে কৃষ্ণময় হয়ে উঠেছে। আকাশ বাতাস, সর্বত্র বিবৃত হচ্ছে সেই শুভনাম। হায় শ্রীকৃষ্ণ, তুমি এতো নিষ্ঠুর কেন? তুমি কি জানো না, কিভাবে জীবনের সাথে লড়াই করে আমি পুরীধামে পা রেখেছি? প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর অন্তরালে তলিয়ে যেতে হয় আমাকে? শুধুমাত্র

তোমার নাম স্মরণ করে সেই মৃত্যুর সরণী থেকে আবার জীবনের রাজপথে পা রাখার সৌভাগ্য অর্জন করি।

হে কৃষ্ণ, তুমি মাধবেন্দ্র পুরীকে সাক্ষাত দিয়েছো। তিনি বৈষ্ণব জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, কৃষ্ণপ্রেম কি বস্তু। কিন্তু আমি? আমি কি এতোই ভাগ্যহীন? তুমি কি আমার সামনে নিজের স্বরূপ উদঘাটিত করবে না?

তখন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের দু চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু নির্গত হচ্ছে। ভাবতে পারছেন না তিনি, কৃষ্ণবিহনে তাঁর দিনগুলি কিভাবে অতিবাহিত হবে।

সতিাই তো বঙ্গদেশ থেকে নীলাচলে আসার পথে কত বাধার সামনে তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছে। তবুও বিন্দুমাত্র চিন্তিত হননি তিনি। দ্বিধা নামক শব্দটিকে ইতিমধ্যেই ভুলে গেছেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভেবেছিলেন—তাঁর প্রাণের ঠাকুরের সাথে অলৌকিক খেলা খেলবেন। দেহমন সব নিঃস্বার্থে দান করবেন শ্রীকৃষ্ণকে। তাঁর এই আন্তরিক অভিলাষ পূর্ণ হয়েছিল কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে নিমাইয়ের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত। তবেই আমরা বুঝতে পারবো নীলাচলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিলিত হতে পেরেছিলেন কিনা!

কৈশোরে পদার্পণের সাথে সাথে নিমাইয়ের চরিত্রে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। এতোদিন তিনি ছিলেন চঞ্চল। বালকোচিত প্রগল্‌ভতা ছিল তাঁর সর্বাঙ্গে। কিন্তু যখনই তিনি কিশোর রাজ্যে প্রবেশ করলেন, তাঁর মনে হলো তিনি বোধহয় অধ্যাত্ম চেতনাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। বন্ধুদের সঙ্গ আর ভালো লাগে না। সারস্বত আলোচনাতে বিন্দুমাত্র আনন্দ খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর দৃষ্টি শক্তি ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। সর্বত্র তিনি কৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করছেন।

মানসিক প্রক্ষোভ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে শ্রীনিমাই গয়াতে যাত্রা করেছিলেন। পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়েও একই রকম অনুভূতির প্লাবন দেখা গিয়েছিল। বিশেষ করে, শ্রীবিষ্ণুর পাদমন্দিরে প্রবেশ করার প্রাক-মুহূর্তে। এটি হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র আর আমি এক নগণ্য মানুষ, এইভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে আছি। তৃষিত তাপিত হৃদয় নিয়ে। হে ঈশ্বর, তুমি এতো নিষ্ঠুর কেন? তুমি বলে দাও, সঠিক কোন অবস্থানে গেলে আমি তোমাকে দুচোখ ভরে অবলোকন করতে পারবো।

অবশেষে হরিনাম সংকীর্তণের মাধ্যমে তিনি ঈঙ্গিত পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে এসেছিলেন নীলাচলে। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি দূর থেকে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরকে প্রত্যক্ষ করেছেন, কেমন যেন হয়ে গেছেন। ব্যাকুলিত স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ঐ বিগ্রহের দিকে। বড় সাধ ছিল গর্ভগৃহে প্রবেশ করবেন। কিন্তু মনের এই অবস্থাতে নিজেকে সংযত করতে বাধ্য হলেন। অনেক দূর থেকে

অপলক তাকিয়ে থাকলেন জগন্নাথের দারু নির্মিত মূর্তিখানির দিকে। মুখে প্রশান্তির হাসি। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের প্রতীক। আর তিনি কিনা এইভাবে এক প্রতিবন্ধী সেজে উঠেছেন। চৈতন্যের দিব্যজ্ঞান হয়ে গেল। তার পর থেকে প্রতিদিন শ্রী শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি অবলোকন করতে যেতেন। দাঁড়িয়ে থাকতেন মন্দিরের সামনে। অবাক বিস্ময় ঠিকরে বেরোতে তাঁর দুটি চোখ দিয়ে। অনেকক্ষণ অপলকে দর্শন করতেন ঐ চন্দন চর্চিত মূর্তিকে। ভেতরে প্রবেশের ইচ্ছাকে দমন করতেন।

প্রথমদিন তিনি ভাবাবেগে উন্মাদ হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন। ঐ বিগ্রহকে আলিঙ্গন করতেই হবে। তখন মন্দির প্রহরীদের ক্ষুব্ধ লাঠির আঘাতে অচেতন হতে হয়েছিল শ্রীচৈতন্যকে। এখনো সেই স্মৃতি তাঁর মনের ভেতর জাগরিত আছে। তাই, দূর থেকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারতেন না শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

ক্রমশ দিন কাটতে থাকে। রাজনৈতিক আকাশ তখন আরো ঝঞ্ঝাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তারই মাঝে নীলাচলে চলেছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের একক অভিসার।

হরিসংকীর্তনের দল খুলেছেন তিনি। মাঝেমধ্যেই খোল করতাল সহযোগে কৃষ্ণের নাম কীর্তন করছেন। এভাবে জীবনের সমস্ত পাপকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। এরই পাশাপাশি সার্বভৌমের কাছে উপনিষদের দুরূহ বিষয়গুলি শিক্ষা করছেন। তারপর প্রচণ্ড জ্ঞান তেজস্বিতায় পরাজিত করলেন সার্বভৌমকে। তিনিও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

তখন সমস্ত শরীরে জেগেছে এক অদ্ভুত ভাবোচ্ছ্বাস। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ" বলে তখন শ্রীচৈতন্য নানা পথে পরিভ্রমণ করছেন। দাক্ষিণাত্যে গেলেন। এবার তাঁকে বৃন্দাবনে আসতে হবে। এই সেই বৃন্দাবন। এখানেই একদা শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলা অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি বিহ্বল চিত্তে পথে ছুটতে শুরু করলেন। উচ্ছ্বসিত ভাবাবেশ অহর্নিশ তাকে তন্ময় করে রেখেছিল।

আবার ফিরে এলেন নীলাচলে। এখানেই তাঁকে জীবনের শেষ প্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অবশেষে অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসে।

তখনো কীর্তন বিলাসে সময় অতিবাহিত করছেন। শরীর ভেঙে পড়েছে। থেকে থেকে ভাবোন্মাদে অবশ হয়ে উঠছেন। বুঝতে পারছেন, শ্রীকৃষ্ণের সাথে একীভূত হবার সময় সমাসন্ন হয়েছে।

কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে। মহাকীর্তন শুরু হয়ে গেছে। ভক্তবৃন্দের সাথে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করছেন। হৃদয় এক অদ্ভুত আনন্দের প্লাবনে প্লাবিত হচ্ছে। জেগেছে কম্পন। মনে পড়ছে দূর অতীতের কথা। নবদ্বীপে থাকাকালীন যখন এভাবেই তিনি নামগান শ্রবণ করতেন, তখন এই শিহরণ দেখা দিতো সর্বশরীরে।

হায় কৃষ্ণ, আমি তোমাকে সখা রূপে প্রার্থনা করছি। তুমি এসে আমার মুদ্রিত চক্ষুর ওপর উপবেশন করো। এই আমার প্রশস্ত বক্ষ আমি তোমাকে উৎসর্গ করলাম। আমার চেতনা তুমি ধারণ করো। আমার স্বপ্ন তুমি নিজের হাতে সাজাও। আমার অবয়ব আমি তোমাকে তুলে দিচ্ছি।

বিশ্বের ইতিহাসে এমন মধুর মিলনের কথা আমরা খুব বেশী জানতে পারি না। একটি পুরুষ অপর একটি পুরুষের সাথে মিলিত হচ্ছেন, একে কি আমরা সমকাম বলতে পারি?

পুরাণ বিদ্যা বিশারদরা বলে গেছেন, যখন শ্রীচৈতন্য শ্রীরাধিকা ভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন, তখন তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন তাঁর পৌরুষের দীপ্তি। নারীত্বের লাবণ্যে উদ্ভাসিতা হয়েছিলেন।

এভাবেই একদিন তিনি শ্রবণ করলেন গীতগোবিন্দের সুর। কোন এক দেবদাসী গুর্জরি রাগে সুমধুর স্বরে তা গাইছে। দূরাগত এই সুর শুনে প্রভু চৈতন্য প্রেমাবিষ্ট হয়ে গেলেন। যে গান গাইছে, সে কি স্ত্রী নাকি পুরুষ, কোথায় গান হচ্ছে, চৈতন্য কোন দিকে লক্ষ্য করেন নি। আবেশের বশে তিনি ছুটে চললেন। পথের কাঁটায় শ্রীঅঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হলো। রক্তপাত শুরু হলো। তিনি বাহ্য জ্ঞান হারিয়েছেন। শশব্যস্তে তাঁর পরিচারক গোবিন্দ তাঁর পশ্চাত ধাবিত হয়েছে।

প্রভু গায়িকার নিকটবর্তী হলেন। তারপর, সেই গান শ্রবণ করে প্রেমাবেশে আবিষ্ট হয়ে গেলেন।

সকলে বুঝতে পারলেন—এবার বোধ হয় নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের দিনগুলি সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। সত্যিই তাই, ক্রমশঃ মনে হচ্ছে, তিনি যেন আরো বেশী কৃষ্ণাভিসারী হয়ে উঠেছেন। অবশেষে, সেই শেষের সেদিনটি এসে গেছে।

স্বরূপ রামানন্দের সাথে কৃষ্ণকথা আলোচনা করলেন। শেষপর্যন্ত তিনি একাকী রজনীর বাকি প্রহর অতিবাহিত করলেন। গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ শয়ন করে আছেন। কক্ষের তিনটি দ্বার রুদ্ধ। মধ্যরাতে প্রভু নির্গত হয়ে গেলেন। গোবিন্দ তা জানতে পারলেন না। তন্দ্রাবস্থায় ছিলেন তিনি।

কোথায় চলেছেন শ্রীচৈতন্য? মনে হলো তাঁর, তিনি যেন বেণুগান শুনে বৃন্দাবনের বুকে পা রেখেছেন। চলেছেন শ্রীরাধিকার কুঞ্জে। তাঁর ভূষণ ধ্বনি চৈতন্যকে বধির করেছে। কৃষ্ণ সহ গোপীগণের হাসি এবং পরিহাস শুনে তিনি উল্লাসে মগ্ন ছিলেন। হায় গোবিন্দ তুমি কেন আবার আমাকে পার্থিব জগতের বুকে এনে ফেললে?

তবু চৈতন্য বলতে থাকেন—

হা হা সখি কি করি উপায়,
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাও,

কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঁও
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায়।
মন মোর বাম দীন
জল বিনা যেন মীন
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্য বদনে
মন নেত্র রসায়নে
কৃষ্ণ কৃষ্ণার দ্বিগুণ বাড়ায়।
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন
হা হা পদ্ম পদ্মলোচন
হা হা দিব্য সদগুণ—সাগর।
হা হা শ্যাম সুন্দর
হা হা পীতাম্বর
হা হা রাসবিলাস নাগর।
কাঁহা গেলে তোমা পাই
তুমি কাঁহা তাহা যাই
এতো কহি চলিল ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি
প্রভুরে আনিল ধরি
নিজ স্থানে বসাইল নিয়া।

প্রভু দিনযামিনী কৃষ্ণ অন্বেষণে মগ্ন। তখন শরৎকাল। মেঘ নির্মুক্ত স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে ধারা প্লাবিত। শুভ্র উজ্জ্বল কিরণ আলোকে জগত স্নাত এবং হাস্যময়। একি মধুর জ্যোৎস্না লোকে প্রভু আনন্দে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করছেন। কখনো বা রাসলীলার গীত শুনছেন। কখনো গাইছেন। কখনো প্রেমাবেশে ইতস্ততঃ ধাবিত হচ্ছেন। কখনো বা চেতন শূণ্য হয়ে ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন।

হঠাৎ তিনি সমুদ্র দর্শন করলেন। মনে হলো তাঁর, চন্দ্রকান্তে উথলিল তরঙ্গ উজল ঝলমল করে যেন যমুনার জল। ঐ যে প্রবাহিত সমুদ্র, সেকি নীল যমুনার জল?

প্রভু জানতে চাইলেন সকলের কাছে। ব্যাকুল হয়ে তিনি কাকে খুঁজছেন? কে? কে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে?

এমন ভাবেই আবার একদিন তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। সমুদ্রের সাথে লীন

হবার এক আশ্চর্য ইচ্ছে তখন চৈতন্যকে গ্রাস করেছে। শেষ পর্যন্ত এক ধীবর অচেতন চৈতন্যকে উদ্ধার করেছিলেন।

প্রেমাবেশে তিনি সমুদ্রে পড়েছেন, ভাগ্যবান ধীবর মহাপুণ্যে তাঁকে জালে উঠিয়েছে। সমস্ত ভয় দূর হয়ে গেছে। চৈতন্য বুঝতে পেরেছেন, আবার তাঁকে নীলাচলে বিলীন হতে হবে। তনু অত্যন্ত শিথিল হয়ে এসেছে। কৃশকায় হয়ে গেছেন তিনি। কথা বলতে বলতে বাহ্যজ্ঞান লোপ পাচ্ছে।

মনে হচ্ছে তাঁর,

পট্টবস্ত্র অলংকার
সমর্পিয়া সখি—কর
সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান
কৃষ্ণ লইয়া কান্তা গণ
হইল জলাবগাহন
জলকেলি রচিল সুঠাম
সখি হে, দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে
কৃষ্ণ মত করি বর
চঞ্চল কর পুষ্কর
গোপীগণ নিজ করি সঙ্গে

গাইছেন তিনি কৃষ্ণ লীলার শেষ গান, যেখানে কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হয়ে শ্রীরাধিকা সখিকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে সখি, সেই নন্দ কুল চন্দ্র কোথায়? সেই ময়ুর পুচ্ছ শোভিত, ইন্দ্রনীলমনি সদৃশ কান্তি, রাসরসে নৃত্যশীল, জীবন রক্ষার মহৌষধি আমার অমূল্য নিধি ও সুধীরশ্রেষ্ঠ কোথায়?

হায় বিধি ধিক তোমায়? এই ভাবাবস্থায় একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি গম্ভীরায় অতিবাহিত করেছিলেন। বিনিদ্র প্রভুর প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করছেন। দ্বারে গোবিন্দ নিদ্রিত। হঠাৎ চৈতন্য বিরহে ব্যাকুল হয়ে উত্থিত হলেন। বাইরে যাবার অভিপ্রায়ে দ্বার খুজতে লাগলেন। অন্ধকারে দ্বার দেখতে না পেয়ে ভিত্তি গাত্রে মুখ ঘষতে লাগলেন। সারারাত ধরে তিনি এমনটি করেছিলেন। ঘর্ষণে মুখ, গণ্ড এবং নাসিকা ক্ষত বিক্ষত হলো। রক্তভারে সর্বাঙ্গ সিক্ত হলো।

গোবিন্দের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন। প্রভু তখন উন্মাত্তের মত আচরণ করছেন।

বৈশাখের এক পূর্ণিমা, ভক্তদের সাথে জগন্নাথদেবের প্রধান উদ্যানে প্রবেশ করেছেন চৈতন্য। শুভ্র-জ্যোৎস্নালোকে উদ্যান এবং উদ্যানপথ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

প্রভু বললেন— প্রফুল্লিত বৃক্ষ বল্লরী যেন বৃন্দাবন
শুক সারি পিক করে আলাপন
পুষ্প গন্ধ লইয়া বহে মলয় পবন
গুরু হইয়া তরুলতা ভৃঙ্গ শিখায় নাচন।

অর্থাৎ চৈতন্যের চোখে তখন নীলাচল বৃন্দাবনের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

হে কৃষ্ণ, আর কতদিন তুমি এভাবে আমাকে অনন্ত জ্বালায় দগ্ধ করবে। তোমার সাথে আমি কি মিলিত হতে পারবো না?

অবশেষে একদিন তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ উর্মিমুখরিত সমুদ্রের চঞ্চলতাকে শ্রীকৃষ্ণ শরীর কল্পনা করলেন চৈতন্য। এই নীল মিশে গেল সেই নীলের সাথে। ডাকছে তাঁকে, সেই কন্দর্পকান্তি পুরুষ। মুখে যাঁর মোহন বাঁশি, যাঁর সমস্ত শরীর থেকে এক অপূর্ব আভার বিচ্ছুরণ ঘটে যাচ্ছে।

হা কৃষ্ণ, আমি রাধিকাবেশে তোমাকে লাভ করার চেষ্টা করেছি। এতোদিনে আমার সেই স্বপ্ন সফল হয়েছে। চৈতন্য চোখ দুটি বন্ধ করলেন। সমুদ্রের অনন্ত লবণাক্ত জলরাশি এসে তাঁকে গ্রাস করলো। শিষ্যগণ হায় হায় করে উঠলেন। বলা হলো, আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে/নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে/সত্য ক্রেতা দ্বাপর কলিযুগ আর/বিশেষতঃ কলিযুগে সংকীর্তন সার। কৃপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন/কলিযুগ আইল এই দেহত বণশয্যা/এই বোল বলিয়া সেই ত্রিজগরায়ত বাহু ঘিরি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়/তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে/জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।

এভাবেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেছিলেন চৈতন্য। এমন ভাবেই শ্রীরাধিকা পেয়েছিলেন তাঁর প্রাণপুরুষকে। এবং যদি আমরা অন্যভাবে বলি, তাহলে বলতে পারি, শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় এভাবেই এক দেহাতীত প্রেমলীলা সাঙ্গ করেছিলেন চৈতন্যের সাথে। যে লীলাকে আমরা দুর্জ্ঞেয় অনন্ত অজ্ঞাত এবং সর্বব্যাপী হিসাবে চিহ্নিত করি।

কৃষ্ণ যখন প্রেমিক এই আখ্যায়িকার গল্পমালা এখানেই শেষ হয়ে গেল। তবে এই গল্পের একটু উপসংহার আছে। সেটি বলে নেওয়া প্রয়োজন।

আমরা সকলেই জানি, কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে কুষ্ঠব্যাধি আক্রমণ করেছিল। তিনি লোকলজ্জার ভয়ে পর্বতের নিভৃত কন্দরে সময় কাটালেন। শরীরের সর্বত্র কুৎসিত আকার ধারণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত অনেক তপস্যা করে, বিভিন্ন পুণ্যঃসলিলা স্রোতস্বিনীর জলধারায় স্নাত হয়ে চন্দ্রভাগার তীরে কঠিন কঠোর জীবন ধারণের পর শাম্ব এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কৃষ্ণপুত্র কেন এইভাবে এক বিকৃত রোগের

শিকার হয়েছিলেন? কেন তাঁর দেহের সর্বত্র পচন দেখা দেয়? কন্দর্পকান্তি ঐ রূপতাপস কিভাবে এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমরা আবার প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের ওপর আলোকপাত করবো, নিজের প্রেমরসে কৃষ্ণ এতোখানি বিভোর ছিলেন যে, পুত্রকে অভিশাপ দিতেও তাঁর হাত কাঁপেনি। চোখের জলে ভেজা সে এক আশ্চর্য কল্প-কাহিনী।

আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণ ষোলো হাজার গোপিনীকে যথেচ্ছ ভোগ করতেন। এই গোপিনীরাও ছিলেন বিচরণকারিণী। শুধুমাত্র কৃষ্ণবংশের পুত্রগণ ছাড়া যাদব শ্রেষ্ঠদের অনেকেই ঐ রমণীদের প্রার্থনা করে থাকেন। যথোচিত সমাদরের সাথে তাদের সঙ্গলাভ করে থাকেন। এটিকে তখনকার সমাজে দূষণীয় বিষয় বলে ধরা হতো না।

কিন্তু কৃষ্ণ যখন শুনলেন, তাঁর পুত্র শাম্ব গোপিনীদের সাথে অবৈধ শরীর খেলায় মেতে উঠেছেন, তিনি এই কথা বিশ্বাস করতে চাননি। কিন্তু নারদের মুখ থেকে এই অভিযোগ শুনে তাঁর অন্তর কেঁপে উঠেছিল। তিনি সত্রাজিৎ কন্যা সত্যভামাকে বিবাহ করেছিলেন। জাম্ববানের কাছ থেকে স্যমন্তক মণি উদ্ধার করেছিলেন। নরককে বধ করে ঐ রমণীদের নিয়ে আসেন নিজস্ব আশ্রয়ে। দুরন্ত মহাবল অরিনিধনকারী বাসুদেব। ষোলো হাজার রমণীকে এইভাবে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই কারণে স্যমন্তক মণি ধারণ করতে পারেন নি। তাই কৃষ্ণ ভাবতেই পারেননি যে গোপিনীরা তাঁর পুত্রের প্রতি আসক্তি বোধ করতে পারে।

সঙ্গীতাচার্য মহর্ষি নারদের এই অভিযোগ তিনি কোনরকমেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে মহর্ষি কখনোই অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবেন না।

অল্পকালের মধ্যেই তিনি মহর্ষির এই অভিযোগের কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু মহর্ষি নারদ একদিন আবার হাজির হলেন কৃষ্ণের কাছে। তিনি যে করেই হোক শাম্বের এই পরকীয়া প্রেমের কথা কৃষ্ণকে জানাবেন।

সেদিন কৃষ্ণ রৈবতক প্রমোদ কাননে তাঁর মহিষী এবং গণিকাদের সাথে জলকেলির সুখে মগ্ন। বাসুদেবকে ঘিরে রমণীরা ক্রীড়াকৌতুকে মরালীর মত ভেসে বেড়াচ্ছে। কেউ কৃষ্ণকে স্পর্শের জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করছে। কেউ আবার মীনের মত সন্তরণ শীলা। কেউ সুরা পানে প্রমত্তা হয়ে প্রণয় কথা উচ্চারণ করছে। কেউ বান্ধবীদের দিকে ঐটি এগিয়ে দিচ্ছে। কেউ আবার নিজেদের মধ্যেই আলিঙ্গনা বদ্ধ হয়ে বাসুদেবকে কল্পনা করছে।

বাতাস তাদের উচ্চহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠেছে।

নারদ আরো দেখলেন সুরা পানে উন্মত্তা রমণীদের অঙ্গের বসন বুঝি শিথিল এবং স্খলিত প্রায় হয়ে উঠেছে। নিজেদের নগ্নতা বিষয়ে তারা বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়। রৈবতকের এই প্রমোদ কাননে কৃষ্ণ হলেন একমাত্র পুরুষ। এখানে আর কেউ কোন ভাবেই উপস্থিত থাকতে পারেন না। এই স্থান কৃষ্ণ ছাড়া সকলের অগম্য।

নারদ বুঝতে পারলেন, এখনই সেই প্রকৃষ্ট সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। রমণীরা সুরাপানে প্রমত্তা। সম্ভোগ ইচ্ছা জেগেছে তাদের মনের মধ্যে। তিনি নগরের প্রাসাদে ফিরে গেলেন। প্রাসাদের কাছাকাছি একটি কুঞ্জের মধ্যে শাম্বকে আবিষ্কার করলেন। সহচরী পরিবেষ্টিত। রূপবান শাম্বকে রমণী বেষ্টনে আরো বেশী রূপবান দেখাচ্ছে।

নারদ দ্বিধা এবং সঙ্কোচ করে বলেছিলেন—শাম্ব, এই মুহূর্তে তোমার কাছে আসা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু তুমি বোধহয় জানোনা, কৃষ্ণ এখন রৈবতকের প্রমোদ কাননে আছেন। সেখানে তিনি তোমাকে স্মরণ করছেন।

শাম্ব তৎক্ষণাৎ তাঁর চেতনা ফিরে পেলেন। মহর্ষি বাক্য কখনো মিথ্যে হতে পারে না। পিতা তাঁকে স্মরণ করছেন, এই আপ্তবাক্য শ্রবণ করা মাত্র তিনি অতি দ্রুত প্রমোদ কাননে উপস্থিত হলেন।

কৃষ্ণ তাঁকে এই অসময়ে সেখানে প্রবেশ করতে দেখে অবাক হয়েছিলেন। কৃষ্ণ আরো অবাক হলেন এই দেখে যে তাঁর শত-সহস্র উপপত্নী তখন অবাক বিস্ময়ে শাম্বকে প্রত্যক্ষ করছে। তাদের সর্ব শরীরে জেগেছে কামোচ্ছ্বাস। এতোক্ষণ তারা শ্রীকৃষ্ণকেই পরম পুরুষ হিসাবে প্রার্থনা করছিল। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিজেদের যৌন কাতর চেহারা পরিস্ফুটিত করার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু যখনই শাম্ব এসে সেই প্রমোদ কাননে প্রবেশ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঐ রমণীদের চোখের দৃষ্টি পরিবর্তিত হলো। কৃষ্ণ হতাশ হলেন। কৃষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এতোদিন পর্যন্ত একটি মিথ্যা অহঙ্কারে অহঙ্কারী ছিলেন তিনি। তিনি ভাবতেন, তিনিই হলেন পুরুষশ্রেষ্ঠ। যেসব নারীকে তিনি নরকের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে স্বর্গের প্রশস্ত উদ্যানে রোপন করেছেন, তারা কখনো দ্বিচারিণী হতে পারবে না।

চোখের সামনে এই দৃশ্য থেকে কৃষ্ণের সেই ভুল ভেঙে গেল।

নারদ বুঝতে পারলেন, এটি হলো তাঁর পরীক্ষার প্রথম ধাপ। কেননা, ঐ রমণীরা তাদের যৌবনোচিত দেহের অধিকাংশই জলের তলায় লুকিয়ে রেখেছে। অনতিবিলম্বে তারা আরো বেশী প্রকটিতা হবে। হলোও তাই। দেখা গেল, নারীরা জল থেকে উঠে এসেছে। মহর্ষিকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা তাদের প্রস্ফুটিত যৌবন শাম্বকে দেখাবার জন্যে অত্যুৎসাহী হয়ে উঠলো। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানা বিভ্রমে তারা শাম্বকে আকর্ষণের চেষ্টা করছে। দেখে মনে হচ্ছে তারা

বুঝি এক-একটি কামনার শিখা জ্বালিয়েছে। ইতিমধ্যেই তারা সুরাসক্ত মাতালিনীর মত আচরণ করছে।

শাম্বকে কাছে আকর্ষণ করার জন্যে নারীদের মধ্যে শুরু হয়েছে এক নীরব প্রতিযোগিতা।

নারদের সাথে কৃষ্ণের ইঙ্গিত পূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হলো। বাসুদেব ক্রোধে এবং গ্লানিতে জ্বলন্ত চোখে রমণীদের দিকে তাকালেন। নারদকে আর কিছুই তাঁর জিজ্ঞাসা করার ছিল না।

মহর্ষি যা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, তা করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন।

কৃষ্ণ কঠিন দৃষ্টিপাত করে ধিক্কার দিলেন। অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করলেন তিনি। তিনি বললেন, তোমরা আমার রক্ষিতা। তা সত্ত্বেও নিকৃষ্ট আচরণ করেছো। মনে হচ্ছে, তোমরা যেন রাস্তার বারবনিতা। অতি প্রমত্তা হয়ে এভাবে তোমরা যে বেশ্যার মত আচরণ করলে তাই আমি অভিশাপ দিচ্ছি, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা তস্করদের দ্বারা লাঞ্ছিতা এবং নিপীড়িতা হবে।

অবশ্য কৃষ্ণের এই অভিশাপ তাঁর মহিষীদের ওপর বর্ষিত হয়নি। তাঁরা হলেন জাম্ববতী, রুক্মিণী, সত্যভামা। আমরা জানি, কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁর ষোলো হাজার গোপিনীকে সত্যি সত্যি নির্মম ভাবে হরণ করেছিলেন দানবেরা এবং তাদের বিকৃতভাবে ভোগ করেছিলেন।

এবার শাম্বের পালা, শাম্ব তাকালেন কৃষ্ণের দিকে। শাম্ব বুঝতে পারলেন, অভিশাপ ঘনিয়ে আসছে।

পুত্রকে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন প্রেমিক রাজা শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বলেছিলেন—তোমার এই রমণী মোহন রূপ নিপাত যাক। কুষ্ঠরোগের কুশ্রীতা তোমাকে গ্রাস করুক।

এই হলেন শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমে নির্মম এবং হৃদয়ে মনোরঞ্জক। যিনি এই পৃথিবীর বুকে কোন প্রতিস্পর্ধী রাখতে চাননি। তাই তিনিই বোধহয় বলতে পারেন যে আমার কোন বৈরী থাকবে না এই পৃথিবীতে। আমি হবো নিষ্কণ্টক। আকাশের মত উদার। বাতাসের মত বেগবান। এবং মগ্ন মৈনাকের মত প্রাজ্ঞ।